পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬১ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ১৫ ওয়াফা ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ১৫ জুলাই ১৯৯৮ ঈসাব্দ

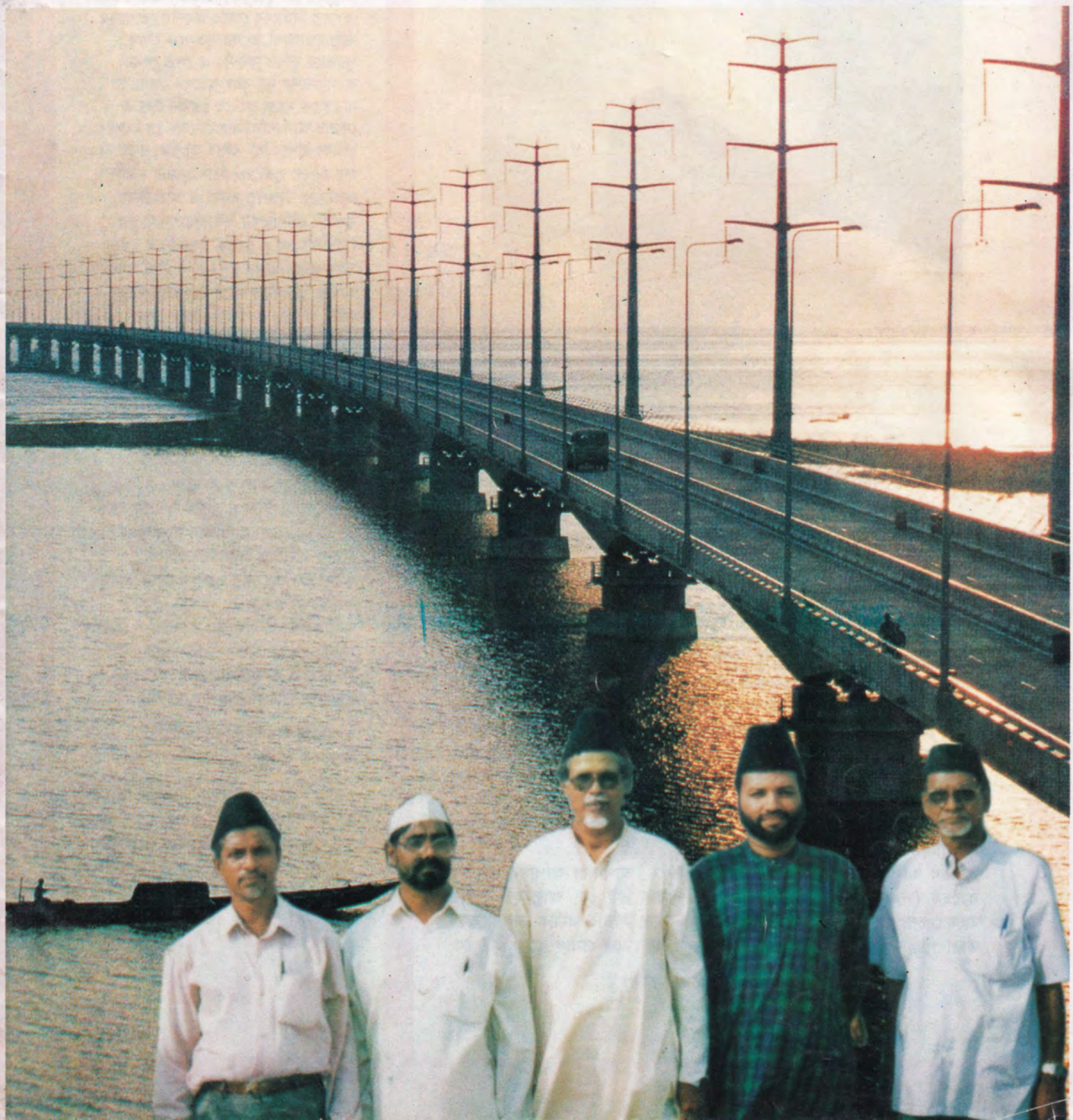

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা ও বর্তমান ইমাম
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) প্রদত্ত

বাংলাদেশের জন্য শান্তির বাণী

বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। বাংলাদেশের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আছে। আমি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি বাংলাদেশের সব এলাকা দেখেছি। আল্লাহ্ আপনাদিগকে খুবই সুন্দর একটি দেশ দিয়েছেন। এমন দেশ যা খুবই প্রিয়, খুবই সুন্দর। দেশের মানুষগুলোও খুবই সুন্দর। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে খুব দ্রুত আহমদীয়তের বিস্তৃতি হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমদের হুমকি সাধারণ ও নিরীহ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তারা তাদের হুমকিতে ভীত হয়ে পড়েন। আপনারা কেবলমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করুন। মানুষের ভয়ে ভীত হবেন না। কাউকে গ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ্র ভয়, হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এমন কথা বলুন, যা মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করে, রেখাপাত করে। ভাল কথা বলুন। শত্রুকে ভয় করবেন না। মনে রাখবেন শত্রুর প্রোপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারের ফলে মানুষ প্রভাবান্বিত হয়ে যায়।

অতএব আপনাদের জন্যে জরুরী বিষয় এই যে, আপনারা আপামর জনতার কাছেই (দাওয়াত) পৌঁছাবেন। আমার ধারণা এই যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় বাংলাদেশের অধিকাংশ আলেমের মন স্বচ্ছ। তাঁরা সত্যিই ধর্মকে ভালবাসেন। তারা পাঞ্জাবী আলেমদের মত কট্টর ও দুষ্ট নন। এর প্রমাণ হলো এই যে,

(অবশিষ্টাংশ ৪ পাতায় দ্রষ্টব্য)

বাংলাদেশের দুই ভূখণ্ডের যোগসূত্র বঙ্গবন্ধু সেতু

যমুনা নদীর ওপরে বিশ্বের ১১ তম বৃহত্তর 'বঙ্গবন্ধু সেতু'। বাঙালি জাতির সোনালী সপ্নের এ সেতু গত ২৩শে জুন '৯৮ মহাসমারোহে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এ সেতু নিঃসন্দেহে আমাদের দেশবাসীর জন্য আল্লাহ্র এক বিশেষ নিয়ামত। যারা যেভাবে এ সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন আল্লাহ্তাআলা তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। এ সেতু যেমন বাংলাদেশের দুই বৃহৎ অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করেছে তেমনি ইহা এ দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও যে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে তা' বলার অপেক্ষা রাখে না। গত ২৫শে জুন '৯৮ আমি আমার মজলিসে আমেলার কতিপয় সদস্য ও আহমদীয়া মুসলিম টেলিভিশন-ইন্টারন্যাশনাল-এর সদস্যগণ সহ এ সেতুর ওপর দিয়ে বগুড়া সফর করি। ঐদিন দুপুর ৪-০০টার সময় আমরা এ সেতুর পার্শ্বে ইস্তেমায়ী দোয়া করি। এ সেতু দেশবাসীর জন্য কল্যাণ ও বরকত বয়ে নিয়ে আসুক এ ছিল আমাদের প্রার্থনা।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) ১৮৮৯ সনে আহমদীয়া জামাত কায়েম করেছেন।আমরা তাঁরই আহ্বানে মানুষকে আল্লাহ্মুখী করতে দেশে ও বিদেশে দাঈইলাল্লাহ্র কাজ করে যাচ্ছি। যেহেতু বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অংশের সাথে রাজধানীর যোগাযোগ এখন সহজসাধ্য হয়েছে– সেহেতু আমাদের জামাতী কর্মকাণ্ডকে এ সেতুর সুফল হিসেবে আরও বিস্তৃত করতে হবে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে এ নিয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত লাভ করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

নোট : বর্তমান সংখ্যা থেকে পাক্ষিক আহ্মদী ৬১ বর্ষ গণনা শুরু হল। এ সম্বন্ধে ১৫-২-৯৮ তারিখের সম্পাদকীয়তে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। – *সম্পাদক*

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬১ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা

৩১ আষাঢ় ১৪০৫ বঙ্গাব্দ ❑ ২০ রবিউল আউয়াল ১৪১৯ হিঃ কাঃ
১৫ ওয়াফা ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ১৫ জুলাই ১৯৯৮ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আব্দুর রব	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

কাফের বানানোর পাঁয়তারা

মহান রবিউল আউয়াল মাস আসলে প্রতিটি মু'মিনের হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকে। এ মাসে আমাদের প্রাণ-প্রিয় নবী, বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর্ত-নিপীড়ত ও বঞ্চিত মানবতাকে পথ নির্দেশনার মাধ্যমে এক সুউচ্চ মাকামে প্রতিষ্ঠাকল্পে। তাই, এ মাস ভর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ মহানবী (সঃ)-এর জীবনাদর্শকে আর একবার দৃষ্টিপটে এনে, তা নিজেদের জীবনে অবলম্বন করার প্রয়াস পায়। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, এ মাসেরই পবিত্র দিনগুলোতে একদল আলেম নামধারী ব্যক্তিত্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অমুসলিম, তথা কাফের ঘোষণা করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যান। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং তাঁর কোনও সাহাবী এমন কোনও ব্যক্তিকে কখনও কি অমুসলিম ঘোষণা করেছিলেন, যে কলেমা পাঠ করত ও নিজেকে মুসলমান বলত? অতএব এরূপ গর্হিত কাজ কি মহানবী (সঃ)-এর আদর্শের বিপরীত কাজ নয়? তিনি এসেছিলেন সারা বিশ্বকে মুসলিম বানাতে আর আজকের আলেমরা মুসলিমকে বানাতে চান কাফের। কী বিপরীত ভূমিকা! অথচ এরাই এখন ধর্মের ধ্বজাধারী। এদেরই একজন খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব গত ৩রা জুলাই পল্টনের খতমে নবুওয়ত সম্মেলনে বলেছেন– "খতমে নবুওয়ত যদি সংরক্ষণ করা না হয় তবে নামায, রোযা, কুরআন রহিত হয়ে যায়। সকল ইবাদাত নষ্ট হয়ে যায় (দৈনিক সংগ্রাম, ৪/৭/৯৮ইং)। কেউ যদি তার এ মন্তব্যের কুরআন ও হাদীস-ভিত্তিক দালিলীক প্রমাণ চায় তাহলে তা খতীব সাহেব দিতে পারবেন কি? কক্ষণও পারবেন না। কুরআনের হেফাযতের ভার তো স্বয়ং আল্লাহ্ নিজ হাতে নিয়েছেন (সূরা হিজর : ১০ আয়াত)। সুতরাং খতীব সাহেবের এ ধরনের মন্তব্য খোদার ওপরে খোদকারী নয় কি?

আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণার জন্যে কতিপয় মৌলবাদী সংগঠন থেকেও আবার দাবী উঠছে এবং এ নিয়ে সভা-সমিতি বিক্ষোভ মিছিল মহাসমাবেশ প্রভৃতি করে সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বিনীত নিবেদন :

১। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ মুসলমান। আমরা কলেমা– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'-তে পূর্ণ বিশ্বাসী। 'খতমে নবুওয়ত'-এর যত প্রকার অর্থ হতে পারে তার সবটাতে আমাদের ঈমান আছে।

২। প্রচলিত আইনে কেউ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট করে নিজেকে মুসলমান বলে ঘোষণা দিলে মুসলমান হওয়ার জন্যে আইনানুযায়ী যথেষ্ট। আমরা ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে নিজেদের মুসলমান বলে দাবী ও ঘোষণা করে আসছি এবং মুসলমান হিসেবেও জীবন যাপন করছি।

৩। ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যেমন সংসদ বা সরকারের কাজ নয় তেমনি ধর্ম নিরূপণ করাও কোন সংসদ বা সরকারের কাজ নয়। ধর্ম আল্লাহ্র জন্যে এবং তিনি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং কেউ যদি গায়ের জোরে ধর্ম নিরূপণ করার জন্যে হাত বাড়ায় তাহলে তা খোদার উপরে খোদকারী হবে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ্তাআলা যে এ হাত গুঁড়ো করে দেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

৪। বাংলাদেশ একটি ধর্ম নিরপেক্ষ (সেক্যুলার) রাষ্ট্র। এ ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের রক্ত দানের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এতে আহমদী মুসলমানের রক্তও নিবেদিত হয়েছে। সুতরাং এ হেন এক রাষ্ট্রে ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা করার অবকাশ কোথায়? যারা একদিন দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে তারা এখন দেশ-দরদী সেজে বসেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে!

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দ্রষ্টব্য)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ(তফসীর সহ)	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ পুণ্যবতী মহিলা ও স্বামীর অধিকার	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ বিশ্বনবীর মো'জেযা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ রসূলে আযম (সঃ) পুস্তক থেকে উদ্ধৃত অনুবাদ– অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	৫-৬
❑ জুমুআর খুতবাঃ সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণদের সাহচর্য হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭-১৩
❑ হাকীকাতুল ওহীঃ মূল–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ– জনাব নাজীর আহমদ ভূঁইয়া	১৪-১৬
❑ খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত মূল– আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী	ঃ অনুবাদ– মরহুম এ. এইচ. এম. আলী আনোয়ার	১৭-১৯
❑ ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব) মূল– হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী, আল মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)	ঃ অনুবাদ– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২০
❑ জুমুআর খুতবাঃ পাকিস্তানে পারমাণবিক প্রযুক্তিবিকাশের সঠিক ইতিহাস হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	২১-২৬
❑ উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৭
❑ ছোটদের পাতাঃ ওকায়াতে শীরী জনাব মির্যা খলীল আহমদ কমর	ঃ পরিচালক– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৮-২৯
❑ বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা মোহতরম মির্যা ওয়াসীম আহমদ	ঃ অনুবাদ– মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৩০-৩৪
❑ ধর্ম কি ও কেন	ঃ মিসেস রওশন আরা হক	৩৪-৩৫
❑ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ চরিত্রের কতিপয় দিক	ঃ অধ্যাপক রজিব উদ্দীন আহমদ	৩৬-৩৮
❑ সাম্প্রদায়িক অপশক্তির নগ্ন হামলা	ঃ সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ	৩৯
❑ সংবাদ	ঃ	৪০

❑ প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ **ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু সেতু**

বঙ্গবন্ধু সেতু প্রকল্পের অর্থের যোগানদাতা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও জাপান। মোট নির্মাণ ব্যয় দাঁড়ায় ৩ হাজার ৬শ' কোটি টাকার উপরে। যমুনা সেতু নির্মাণের কাজটি ৩টি অংশে বিভক্ত ছিল। এর মূল সেতুটি নির্মাণ করে হুন্দাই, নদী শাসন কাজ করে হ্যান-ভ্যান এবং এপ্রোচ রোড নির্মাণ করে স্যামওয়ান। সেতু নির্মাণ কালের চার বছরে প্রায় ১৫ হাজার লোক এখানে কাজ করেছেন। সেতুটিতে যান চলাচলের জন্য দু'লেনবিশিষ্ট সড়ক রয়েছে। একপাশে রয়েছে ডুয়েল গেজ রেললাইন। রয়েছে দেশের দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম ইন্টার কানেকটর। ব্রিজের নীচ দিয়ে নির্মাণ কাজ হচ্ছে গ্যাস লাইন। সেতুটি নির্মাণে ৪ লাখ সিএফটি পাথর, ৮৬ লাখ ঘনমিটার বালু, ১১ দশমিক ৫ কোটি ব্যাগ সিমেন্ট, ৩৬ জাহার টন ষ্টিল প্লেট, ১৭ দশমিক ৫ হাজার টন বিটুমিন, ৫০ হাজার টন কিল আর ৭ লাখ বাঁশ ব্যবহার করে এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ইহা বিশ্বের ১১ তম দীর্ঘ সেতু।

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

৫। বাদশাহ্ ফয়সল, লারকানার নবাব জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেনারেল জিয়াউল হক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারাই আহমদী মুসলমানের বিরুদ্ধে হাত উঠিয়েছে, তারা আল্লাহ্তালা তাদের হাত গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশে কোন দল বা নেতা যাতে এ ধরনের খোদা-বিরোধী বেআইনী ও অমানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অপচেষ্টা না করেন সেজন্যে আমরা তাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি।

৬। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এর হাজারো রকমের সমস্যা আছে। মোল্লা ভাইয়েরা মনে করেন যে, "কাদিয়ানী সমস্যা"-ই একটি বড় সমস্যা। পাকিস্তানের মোল্লারাও তাই ভেবে ভুট্টোকে চাপ দিয়ে, তোয়াজ করে এবং ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে 'কাদিয়ানী'দের অমুসলমান ঘোষণা করিয়েছে। ফল কি হয়েছে? এখন মোল্লাদের অবস্থান কী? দেশের বারোটা বাজিয়ে তবে ছেড়েছে। আর আহমদীয়া জামাতের বর্তমান অবস্থা কী? এথেকে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৭। মোল্লা ভাইদের প্রতি আবেদন– 'আহমদীয়্যত' মহান আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক রোপিত একটি বৃক্ষ। যখন ইহা কচি চারাগাছ ছিল তখনই আপনাদের কুফরী ফতুয়া এর কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। আর এখন তো ইহা বিশ্বের ১৬০টিরও অধিক রাষ্ট্রে শিকড় বিস্তার করেছে। দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। সুতরাং এর বিরোধিতা থেকে ক্ষান্ত হয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য ঐশী-ব্যবস্থা **মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' পাঠ করুন**। দোয়ার মাধ্যমে কাজ নিন। মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যদি আল্লাহ্র প্রিয় ও মনোনীত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে তাঁকে মেনে নিতে সচ্চেতা লোকের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের শেষ কথা– আল্লাহ্তাআলা সকলকে সঠিক পথ লাভের সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

কুরআন মজীদ

সূরা আল্ মায়েদা-৫

১৪। সুতরাং তাহাদের নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের হৃদয়গুলিকে কঠিন করিয়া দিয়াছিলাম। (ফলে) তাহারা (কিতাবের) শব্দগুলিকে উহাদের আসল স্থান হইতে রদ-বদল করে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল উহার কতক অংশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এবং তুমি তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন ব্যতীত তাহাদের পক্ষ হইতে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবে। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপক্ষো করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।[৭২৭-খ]

১৫। এবং যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান', তাহাদের নিকট হইতেও তাহাদের অঙ্গীকার[৭২৭-গ] লইয়াছিলাম, কিন্তু যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারাও উহার কতক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি। এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছিল সেই সম্বন্ধে শীঘ্রই আল্লাহ্ তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

১৬। হে আহ্লে কিতাব! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং তোমরা কিতাবের মধ্য হইতে যাহাকিছু গোপন করিতেছিলে সে উহার বহুলাংশ তোমাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং বহুলাংশ মার্জনা করিতেছে; অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট হইতে নূর[৭২৭-ঘ] ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

১৭। আল্লাহ্ উহা দ্বারা ঐ সকল লোককে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি চাহে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি নিজ আদেশে তাহাদিগকে (প্রত্যেক প্রকার) অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

১৮। তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্-তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ্।' তুমি বল, 'আল্লাহ্র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ্[৭২৮] ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন?' আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলের উপর আধিপত্য আল্লাহ্র। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯। আর ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র এবং তাঁহার প্রিয় পাত্র।' তুমি বল, 'তাহা হইলে কেন তিনি তোমাদের পাপসমূহের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন? না, বরং তোমরাও সেই সকল মানুষের অন্তর্গত যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।' তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার উপর আল্লাহ্রই আধিপত্য এবং তাঁহারই সমীপে প্রত্যাবর্তন।

২০। হে আহলে কিতাব! রসূলগণের (আবির্ভাবের) বিরতির পর তোমাদের নিকট আমাদের রসূল আসিয়াছে, যে তোমাদের নিকট (সকল বিষয়) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতেছে পাছে তোমরা বল যে, 'আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা আসিয়াছে এবং না কোন সতর্ককারী।'[৭২৯] সুতরাং তোমাদের নিকট অবশ্যই সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী আসিয়াছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান। (৩ রুকূ)

২১। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ[৭৩০] করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে এমন কিছু দান করিয়াছিলেন যাহা তিনি (তদানিন্তন) জগতের অন্য কোন জাতিকে দেন নাই;

৭২৭-খ। ইহুদীদের সম্বন্ধে এই আয়াতের বর্ণনা অত্যন্ত খাঁটি।

৭২৭-গ। এই কথাগুলি ঈসা (আঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে, যাহাতে তিনি তাঁহার পরে আগমনকারী মহানবীর কথা তাঁহার অনুসারীদিগকে জানাইয়াছিলেন (যোহন-১৬ঃ১২-১৩) এবং যাহা খৃষ্টানগণ উপেক্ষা করিয়াছে এবং ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে।

৭২৭-ঘ। "নূর" অর্থ এখানে আঁ হযরত (সঃ) (৩৩ঃ৪৬, ৪৭)।

৭২৮। এখানে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে এবং "ঈসা আল্লাহ্র পুত্র", এই মারাত্মক বিশ্বাসকে শক্ত ভাষায় ঘৃণা ও তিরস্কার করা হইয়াছে। এইরূপ ১৯ঃ৮৯-৯২ আয়াতগুলিতেও এই বিশ্বাসকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে।

৭২৯। ঈসা (আঃ) ও মহানবী (সঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন দেশে নবী আসিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না; আহ্লে কিতাবদের মধ্যেতো নয়ই। তবে, বিশ্ব তখন সর্বশ্রেষ্ঠ পরিত্রাণকারী মহাপুরুষের আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং প্রস্তুতিও নিতেছিল। অবশ্য, কিছু কিছু সন্দেহযুক্ত বিবৃতি এমন পাওয়া যায় (কল্‌বী), যাহাতে ঈসা (আঃ)-এর অব্যবহিত পরে নবীরা আসিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে একজনের নাম খালিদ-বিন্ সালাম বলা হইয়াছে। কিন্তু মহানবী (সঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তাঁহার (সঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যকার সময়ে কোন নবী আসেন নাই (বুখারী)।

৭৩০। 'ফীকুম' না বলিয়া কেবল 'কুম' শব্দ ব্যবহার করিয়া আল্লাহ্তাআলা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, যে কোন জাতি বা গোত্রের মধ্যে বাদশাহ্ থাকে, সেই জাতির সকলেই বাদশাহ্তের মর্যাদার কিছুটা স্বাদ নানাভাবে উপভোগ করিবার সুযোগ পায়; ঐ জাতির সাধারণ জনগণ আংশিকভাবে হইলেও প্রভুত্ব ও স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু নবুওয়তের ক্ষেত্রে এই অংশীদারীত্ব খাটে না, আংশিকভাবেও না।

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মহীস্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

لعنة الله على الكاذبين

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

হাদীস শরীফ

পুণ্যবতী মহিলা ও স্বামীর অধিকার

কুরআন : رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের *মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান করো আর আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম* বানাও (সূরা আল্ ফুরকান : ৭৫)।

হাদীস : আন আবদিল্লাহিবনে আওফা কুলা কুলা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামা ওয়াল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদিন বেইয়াদিহি লা তুওয়াদ্দিল মারআতু হাক্কা রব্বেহা হাত্তা তুওয়াদ্দি হাক্কা যাওজিহা *(ইবনে মাজা)*।

অর্থাৎ হযরত আবদিল্লাহিবনে আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ, কোন মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত খোদার হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করে (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা :

হযরত নবী করীম (সঃ) একদিকে পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার শিক্ষা দিয়েছেন অপর দিকে স্ত্রীদের জোরালোভাবে তাগাদা দিয়েছেন তারা যেন স্বামীদের হক ও অধিকার আদায় করে। একটি গৃহে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখময় সম্পর্ক বিরাজ করে। হযরত নবী করীম (সঃ) অপর এক স্থানে বলেছেন যে, কারও স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সেই স্ত্রী খোদার ফযলে জান্নাতে যাবে।

কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে জানা যায় যে, স্ত্রী ঘরের শান্তির কারণ। এমন স্ত্রী, যে ঘরের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে ও চেষ্টায় রত থাকে খোদাতাআলা যেন তার সাহায্যকারী হয়ে যান। এবং এমন গৃহে খোদার তরফ হতে বরকত ও আশীষ নাযেল হয়।

আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) কসম খেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, খোদাতাআলার দৃষ্টিতে সে-ই সফলকাম হবে, যে এ জগতে মানবীয় সম্পর্কের প্রতি খেয়াল রাখবে। এমন হৃদয় খোদার প্রতিও ঝুঁকবে। কারণ মানব-প্রেমই খোদা-প্রেমে রূপান্তরিত হয়। আজকের সমাজে সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতার অর্থাৎ বুঝা-পড়ার অভাব। ফলে নৈতিকতার অধ:পতন প্রকট রূপ ধারণ করছে। যে শিক্ষা মানব জীবনে শান্তি বয়ে এনে দিতে পারে আজ আমরা এই শিক্ষা হতে দূরে চলে এসেছি। ঘরের শান্তিই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়। সুতরাং স্ত্রীগণ যদি তাদের স্বামীদের হক আদায় করতে সোচ্চার হয় তবে সন্তান-সন্ততিদের তরবীয়তও উন্নতর হবে। আর এ সবকিছু দোয়ার মাধ্যমে সম্ভব, আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আঁ হযরত (সঃ)-এর শিক্ষার উপর আমল করে সুখের নীড় গড়ে তুলতে পারি (আমীন)।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : **মাওলানা সালেহ আহমদ**, সদর মুরব্বী

(২য় প্রচ্ছদের শান্তির বাণীর অবশিষ্টাংশ)

পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন। যদি হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবের আলেমরা আসলেই কট্টর না হতেন তাহলে সেখানে ইমাম মাহদী (আঃ) আসতেন না। সবচে' খারাপ লোক যেখানে থাকে আল্লাহ্‌তাআলা সে স্থানকেই তাদের সংশোধনের জন্যে সতর্ককারী পাঠাবার স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন।

আল্লাহ্‌তাআলা এই পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আমি যেসব কথা বলছি তা কুরআন এবং হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলছি। বাংলাদেশের আলেমগণ কখনো দুষ্টুমিতে পাঞ্জাবী আলেমদের সাথে পারবেন না। কোনক্রমে পাঞ্জাবীদের সাথে দুষ্টুমিতে পাল্লা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। প্রয়োজনে যতটা ইচ্ছা প্রতিযোগিতা করে দেখতে পারেন। যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলা হয় তাহলে বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উগ্র প্রকৃতির মৌলভীও নমনীয়-কমনীয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, যাদের ভাগ্যে সংশোধন নেই এমন লোক সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। যারা কথার মাঝে শোরগোল করে উঠে যায়, এদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিন। যারা শোরগোল করে উঠে যায় তাদেরকে পরিহার করুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, অধিকাংশ আলেমের নিকট যাওয়া আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের সাথে যুক্তি-প্রমাণ ও ভালবাসার সাথে কথা বলুন। বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। দেখবেন কত বিপুল সংখ্যক আলেম আমাদের সমর্থনে এসে যান। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। জনসাধারণের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের নিকট গিয়েও বলুন যা উলামাকে বলেছেন। ফলশ্রুতিতে এমন অনেক শ্রেণী আপনাদের সমর্থনে এসে যাবেন। আর তখন আহমদীরা নির্ভয়ে আহমদীয়তের কথা প্রচার করার সুযোগ পাবেন। প্রথমে আলেমগণের হৃদয় জয় করুন, জন প্রতিনিধিদের মন জয় করুন, তারপর জনসাধারণের মন জয় করুন। এইরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রচারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। এমন হলে বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে যেখানে খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মৌলভীরা ইসলামের নামে সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তারা মানুষকে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা দেয় না। তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা রাখে না। মানুষ অনাহারে মরলেও এদের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন মাথা ব্যথা। ইসলামী রাষ্ট্র তো এমন হবে যেখানে মানুষের দারিদ্রকে দূর করা হবে। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক খোরাকেরই চিন্তা করা হবে না বরং দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক খোরাকেরও ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালবাসা ও সমবেদনা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে, তাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আজ আপনাদের সকল প্রকার অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আহমদীয়ত। দেশের দারিদ্র, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অশান্তি, যুলুম-অত্যাচার এইসব কিছুর হাত থেকে একমাত্র আহমদীয়তই আপনাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারে–উদ্ধার করতে পারে। আমি আশা করি আপনারা আমার এই বার্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন। খুব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করে নিন যা আমি বলেছি। যে ব্যবস্থা-পত্র আমি দিয়েছি ইহাই সঠিক ব্যবস্থা-পত্র। এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা-পত্র আপনারা কোথাও খুঁজে পাবেন না।

আমি বাংলাদেশের মন জয় করতে চাই। যতশীঘ্র সম্ভব এই মহা বিপ্লব সাধন করতে হবে। পাকিস্তানের মৌলভীরা বারবার বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করছে যেন এদেশও পাকিস্তানের মত হয়। এমনিতেই আপনারা অনেক কষ্টে আছেন। আপনারা পাকিস্তানীদের মতই যদি হতে চান তাহলে কেন আপনারা এথেকে পৃথক হয়েছেন ? পাকিস্তানের কথা ছেড়ে দিন। পাকিস্তানে যে নোংরা আবর্জনা ছেয়ে আছে তা আপনারা কিছুতেই গ্রহণ করবেন না।

আপনারা বড় বড় বুদ্ধিজীবী, পত্রিকার প্রতিনিধি, বড় বড় মিডিয়ার প্রতিনিধি এবং বড় বড় সম্মানীত জ্ঞানীজন রয়েছেন। আমি জানি তাদের হৃদয় সাক্ষ্য দেবে যে, আমি সত্য বলছি। অতএব আমার আবেদন এই যে, আমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমার কথার সমর্থন করুন। আমার এই বাণীটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হউন।

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর ১৪-২-৯৮ তারিখের পয়গাম থেকে সংকলিত]

অমৃত বাণী

বিশ্বনবীর মো'জেযা

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

যেহেতু আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং রসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, সর্বোন্নত ছিলেন, সেহেতু খোদাতাআলার এই অভিপ্রায়ও ছিল যে, আঁহযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম যেমন নিজস্ব সত্তার মণি-মুক্তোর নিরিখে বাস্তবিক পক্ষেই সকল নবীদের নেতা, তেমনিভাবে, প্রকাশ্য খেদমতের নিরিখেও তাঁর সকলের উপরে উন্নত ও উত্তম হওয়াটাও প্রকাশিত হোক, উদ্ভাসিক হোক। এজন্যই খোদাতায়ালা আঁহযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সকল বনী আদমের জন্য সার্বজনীনরূপে আবির্ভূত করেছেন, যাতে করে আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাসমূহ সার্বজনীনভাবে প্রকাশিত হয়, এবং সকল দিক থেকে সকল জাতির যুলুম ও নির্যাতন পোহাবার দরুন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভের অধিকারী হবেন যা অন্য আর কোন নবীই লাভ করবেন না।' – (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ৬৩১, ৬৩২)।

'আমি বিশ্বাস করি যে, যদি রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে পৃথক করা যেত, এবং সমস্ত নবী যাঁরা ঐ সময় পর্যন্ত অতীত হয়ে গেছেন, তারা সবাই একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে সেই কাজ ও সেই সংশোধন করতে চাইতেন, যা রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম করেছেন, তবে তা কিছুতেই করতে পারতেন না। তাঁদের মধ্যে সেই হৃদয় ও সেই শক্তি ছিল না, যা আমাদের নবীকে দান করা হয়েছিল। কেউ যদি বলে যে, এ তো নবীদের প্রতি (মায়াযাল্লাহ্) দারুণ বেআদবী! তাহলে, সেই নাদান বা মূর্খের পক্ষে অপবাদ আরোপ করা হবে আমার প্রতি। নবীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করাকে আমি আমার ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করি, কিন্তু, সকল নবীদের উপরে নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে আমার ঈমানের সর্বপ্রধান অঙ্গ, তা আমার শিরা-উপশিরায় মিশে আছে। এবং তাকে আমি বের করে দেই, সে এখ্তিয়ার আমার নেই। হতভাগ্য ও দৃষ্টিহীন বিরুদ্ধবাদীরা যা খুশী বলতে পারে। তবে, (সত্য এটাই যে,) আমাদের নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে কাজ করেছেন, তা অন্যদের দ্বারা না পৃথক পৃথকভাবে, না সমবেতভাবে সমাধা হতে পারতো। এবং এ হচ্ছে আল্লাহ্তাআলার ফযল। এ হচ্ছে আল্লাহ্র ফযল বা কৃপা, তিনি যাকে চান দান করেন (৬২ঃ৫) – (মলফুযাত, ক. ২, পৃ: ১৭৪)

'আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম তিন সহস্রাধিক মো'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেছিলেন। আর ভবিষ্যদ্বাণীর সংখ্যার তো কোন সীমা নেই। কিন্তু, আমাদের প্রয়োজন নেই যে, আমরা ঐ সমস্ত অতীত মো'জেযার বিবরণ দেই। বরং, আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি অতি মহান বা আযিমুশ্শান মো'জেযা এই যে, সমস্ত নবীগণের ওহী বাদ পড়ে গেছে এবং তাঁদের মোজেযাগুলিও পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, এবং তাঁদের উম্মতরাও খালি হাতে বসে আছে এবং তাদের হাতে এখন আছে শুধু কেচ্ছা এবং কাহিনী। কিন্তু আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওহী বাদ পড়েনি তাঁর মো'জেযাগুলিও পরিত্যক্ত হয়নি। বরং সর্বদা উম্মতের কামেল ব্যক্তিগণের, যারা তাঁর আনুগত্যের বদলে সম্মানিত হয়েছেন তাঁদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।এই কারণে **ইসলাম ধর্ম একটি জীবন্ত ধর্ম, এবং তাঁর খোদা জীবন্ত খোদা**। বস্তুতঃ, এই যামানাতেও সেই সাক্ষ্য পেশ করার জন্য আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের এই বান্দা উপস্থিত রয়েছে। আজ পর্যন্ত আমার হাতেও রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এবং কিতাবুল্লাহ্র সত্যতা প্রদর্শনের পক্ষে হাজারো নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এবং প্রায় প্রতিদিন আমি খোদাতাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত হই।' – (চশমা মসীহ, পৃ. ১৮, প্রথম সংস্করণ)।

'আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদাতায়ালার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মো'জেযা প্রকাশিত হয়েছিল তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তার ধারবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউ তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না, যদিও নবীর ধর্মেই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এক বিশেষ গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি খাতামুন্নবীঈন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওয়তের সমস্ত পূর্ণতা উৎকর্ষতা বা কামালত তাঁর উপর খতম হয়ে গেছে; এবং এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,– তাঁর (সঃ) পরে শরীয়তওয়ালা আর কোন রসূল নেই; এবং তাঁর (সঃ) পরে এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মত বহির্ভূত। বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি খোদাতাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সঃ) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিম বা সরাসরি নবী নন। তাঁকে (সঃ) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দণ্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ, যাঁরা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সঃ) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমানকালেও মুসলমান বাদশাহ্গণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সঃ) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই যে হাজারো ঐশী আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরাবান্বিত যে, যে নবী সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর উপরে খোদাতাআলার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। **তিনি খোদা নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি**। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বোঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়ত কি জিনিস। এছাড়া মো'জেযা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সঃ) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী সাহায্য। আমরা কী বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন শক্তি অন্য সবার ধারণার

অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সল্লামের কারণেই আমাদের উপরে প্রকাশিত হয়েছে' – (সংযুক্ত প্রবন্ধঃ চশমা মা'রেফত, পৃ: ৮-১০)।

সকল গৌরবের অধিপতি সর্বশক্তিমান খোদাতাআলা যেভাবে সমগ্র জগতের বিপক্ষে, সকল বিরূদ্ধবাদীদের বিপক্ষে, সমস্ত দুশমনদের বিরুদ্ধে, সমস্ত অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে, সকল বিত্তবানদের বিপক্ষে, সকল পরাক্রমশালীদের বিপক্ষে, সমস্ত রাজা-বাদশাগণের বিপক্ষে, সমস্ত জ্ঞানী-গুণীদের বিপক্ষে, সকল দার্শনিকদের বিপক্ষে এবং সকল ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে একজন নিরীহ, দুর্বল, দরিদ্র, নিরক্ষর ব্যক্তিকে পূর্ণ গৌরব ও প্রতাপসহ আপন ঐশী শক্তি প্রকাশের সাহায্যে সাফল্য দান করার অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁর প্রতি কি কোন ঈমানদার ব্যক্তি বা কোন সত্যান্বেষী সন্দেহ পোষণ করতে পারে, যখন তা সময়মত পূর্ণ হয়েছে এবং পূর্ণ হয়েও চলেছে? একি কোন মানুষের কাজ? দেখো! একজন নিরীহ, নিঃসম্বল, নিঃসহায়, নিঃস্ব ব্যক্তি এমন এক সময়ে তাঁর ধর্মকে প্রচার করার জন্য এবং ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঘোষণা দিয়েছিল যখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন মাত্র নিঃস্ব দরবেশ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এবং মুসলমানদের সংখ্যাও এমন ছিল যে, তাদেরকে একটা ছোট কামরার মধ্যেই একত্র করা যেতো, এবং হাতের আঙ্গুলে নাম ধরে ধরে গণনা করা যেতো, যাদেরকে সেই শহরের কিছু সংখ্যক লোক ইচ্ছা করলেই মেরে ফেলতে পারতো; তাদেরকেই মোকাবেলা করতে হয়েছে শাসকদের ও সম্রাটদের। এবং তাদেরকে ঐ সমস্ত জাতির মোকবেলা করতে হয়েছে, যারা সংখ্যায় কোটি কোটি ছিল এবং তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে দৃষ্টি ফেরায়ে দেখো, খোদাতাআলা কীভাবে ঐ সকল নিঃসম্বল ও দুর্বল লোকদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং কীভাবে তাদেরকে শক্তি এবং সম্পদ এবং রাজত্বসমূহ দান করেছেন, এবং কীভাবে সিংহাসনে আরোহণকারীদের মুকুট ও সিংহাসন তাদের কাছে সমর্পণ করেছেন। একদিন এমন ছিল, যেদিন তাদের জামাত এতো ছোট ছিল যে একটি ঘরও ভর্তি হতো না; আর আজ তারা সংখ্যায় পৃথিবীতে কোটি কোটি হয়ে গেছে। খোদাতাআলা বলেছিলেন, আমি আমার কোরআনকে নিজেই হেফাযত করবো। এখন দেখো! এই কথা সত্য না মিথ্যা? সেই যে শিক্ষা যা আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর সেই কালামের মাধ্যমে দান করেছিলেন, তা চিরকাল ধরে তাঁর সেই কালামের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। আর সেই কালামের অর্থাৎ কোরআন শরীফের লক্ষ লক্ষ হাফেয রয়েছে এবং এই ধারা সেই কাল থেকেই চলে আসছে। খোদা বলেছিলেন যে, আমার কিতাবের জ্ঞান-হেকমতে, মা'রেফতে, ভাষার উৎকর্ষতায়, রচনাশৈলীতে এবং ঐশীজ্ঞানের প্রকাশে, ধর্মীয় দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনে কখনোই কোন মানুষ মোকাবেলা করতে পারবে না। এবং কেউই তার মোকাবেলা করতেও পারেনি। আর কেউ যদি এটা অবিশ্বাস করে তাহলে সে পারলে এখনো মোকাবেলা করে দেখাতে পারে। এবং পারলে সে আমাদের এই পুস্তকের সত্যতা ও সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী– যা আমরা কোরআন শরীফ থেকে বর্ণনা করেছি– তার সমকক্ষ কোন পুস্তক রচনা পেশ করুক, এবং এজন্য আমরা দশ হাজার টাকার এক পুরস্কারও ঘোষণা করেছি। আর যতক্ষণ সে তা করতে চেয়ে পেশ না করবে, ততক্ষণ সে অবশ্যই খোদাতাআলার কাছে অপরাধী বলেই গণ্য থাকবে। খোদা বলেছিলেন যে, সিরিয়াকে খৃষ্টানদের দখল থেকে বের করে এনে মুসলমানদেরকে সেই দেশের উত্তরাধিকারী বানাবে। বস্তুতঃ আজও পর্যন্ত মুসলমানরাই সেই দেশের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পৃক্ত ছিল। এগুলি এমন ছিল না যে, জ্যোতিষীদের মত বলে দেওয়া যে, ভূমিকম্প হবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, এক দেশ আর এক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, মহামারী দেখা দিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। খোদার কালামের অনুসরণে এবং তার প্রভাব ও কল্যাণের কার্যকারিতায় যারা কোরআন শরীফের আনুগত্য এখতিয়ার করে এবং খোদাতাআলার রসুলে মকবুল (সঃ)-এর প্রতি শুদ্ধচিত্তে ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখে, এবং তাঁকে সমগ্র সৃষ্টি এবং সকল নবী এবং সকল রসুল, সকল পবিত্রচিত্ত ব্যক্তি, এবং সমস্ত কিছু যা ঘটে গেছে এবং আগামীতে ঘটতে থাকবে, তার সকল কিছুর উপরে উত্তম, পবিত্র, পূর্ণ, উৎকৃষ্ট ও উন্নত বলে জানে ও মানে, তারাও ঐসকল নেয়ামত বা কলাণ থেকে অংশ পেয়ে থাকে। এবং যে শরবত মূসা ও মসীহ্‌কে (আঃ) পান করানো হয়েছিল, তারাও সেই শরবত প্রচুর পরিমাণে, তৃপ্তির সঙ্গে, প্রাণভরে পান করেছে এবং এখনও পান করছে। ইসরাঈলী আলো দ্বারা তারা আলোকিত, বনী ইয়াকুব-এর পয়গম্বরদের আশিস ও কল্যাণ দ্বারা তারা ভূষিত। সোবহানাল্লাহ্! সুম্মা সোবহানাল্লাহ্! (আল্লাহ্ কত পবিত্র! আবারও বলছি, আল্লাহ্ কতই না পবিত্র!) হযরত খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম কতই মহান মর্যাদার নবী! আল্লাহ্! আল্লাহ্! কত আযিমুশ্‌শান নূর– মহামহিমান্বিত আলো। যার নগণ্য খাদেম, অধম থেকে অধম উম্মত, যার নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট চাকরও ঐ সমস্ত উন্নত স্তরে পৌছে যাচ্ছে।

আল্লাহুম্মা সল্লে 'আলা নবীয়্যেনা ও হাবীবানা সাইয়্যেদুল আম্বিয়ায়ে ওয়া আফযালুর রসূলে ওয়া খায়রুল মুরসালীন ওয়া খাতামুন্নবীঈন মুহাম্মদেঁও ওয়া আলেহি ও আসহাবেহি ওয়া বারিক ওয়া সল্লিম।

এই জামানার পাদ্রী এবং পণ্ডিত এবং ব্রাহ্ম এবং আর্য এবং অন্য সব বিরুদ্ধবাদীরা যেন চমকে না উঠেন যে, কোথায় সেই সকল আশিস ও কল্যাণ? কোথায় সেই আসমানী নূর বা ঐশী আলোক, যার দ্বারা হযরত খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের রহমতপ্রাপ্ত উম্মত মসীহ্ এবং মূসার (আঃ) কল্যাণরাজি দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত এবং সেই আলোকরাশি দ্বারা আলোকিত যার থেকে অন্য সকল জাতি এবং সকল ধর্মের অনুসারীরা বঞ্চিত রয়েছে এবং হতভাগ্য হয়ে গেছে? এই কুধারণাকে দূর করার জন্য আমরা বারবার এই পাদটীকাতেই লিখে দিয়েছি যে, সত্যান্বেষীর জন্য, অর্থাৎ যে ইসলামের বিশেষ বিশেষ কল্যাণ ও আশিস দেখে তৎক্ষণাৎ মুসলমান হওয়ার সৎসাহস রাখে, তার কাছে প্রমাণ পেশ করার জন্য আমরা জিম্মা রয়েছি। দ্বিতীয় পাদটিকায় আমরা বিষয়টি পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত করেছি। বরং আমরা এই পাদটীকায় একথাও লিখে দিয়েছি যে, কীভাবে খোদাতালা তাঁর ঐশী ক্ষমতাবলী এবং কৃপা ও কল্যাণসমূহ মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রকাশ করে থাকেন এবং কীভাবে তিনি সেই সব ঘটনাবলীর শুভ-সংবাদ তাদেরকে দিয়েছেন, যা কিনা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। অতএব যদি কোন পাদ্রী অথবা পণ্ডিত অথবা ব্রাহ্ম, যে তার নিজের অভ্যন্তরীণ অন্ধকারের কারণে এই সমস্ত বিষয়কে অস্বীকার করে; কিংবা কোন আর্য অথবা অন্য কোন ধর্মের কোন অনুসারী যে সত্য সত্যই সততার সঙ্গে সত্যের অনুসন্ধান করে, তার উচিত যাবতীয় গর্ব, ঔদ্ধত্য এবং ভণ্ডামী ছেড়ে, এবং দুনিয়ার পুজা বাদ দিয়ে, গোয়ার্তুমী ও অবজ্ঞা-অবহেলা পরিত্যাগ করে, শুধু সত্যের অন্বেষণ এবং সত্য পাওয়ার জন্যেই সোজা আমাদের কাছে চলে আসা। তার উচিত এক গরীব ও নিরীহ মানুষের মত আশা এবং সবর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য অবলম্বন করা এবং সৎ মানুষের ন্যায় অনুগত ও আন্তরিক হওয়া, তাহলেই সে তার লক্ষ্যে পৌছতে পারবে, ইনশাআল্লাহ্। এর পরও যদি কেউ তার মুখ ফেরায়ে নেয়, তবে সে নিজেই তার বেঈমানীর সাক্ষী হবে – *(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ, ২৫৬-২৬৫, পাদটীকা ১১)*।

[রসূলে আযম পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

অনুবাদ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

জুমুআর খুতবা

সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণদের সাহচর্য অবলম্বন

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ, খলীফতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা তাং ৮ই মে, ১৯৯৮ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্‌হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা তওবার ১১৯ তম আয়াত তিলাওয়াত করেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩

[অর্থ : হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যপরায়ণদের সহচারী হও। –অনুবাদক) অতঃপর বলেন, ইহা সেই আয়াত, যা বিগত খুতবায় তিলাওয়াত করেছিলাম। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরও কয়টি উদ্ধৃতি উপস্থাপন সময়াভাবে সম্ভব হয় নি। আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, আলোচ্য বিষয়-বস্তুই আগামী খুতবায়ও অব্যাহত থাকবে এবং এই উদ্ধৃতি-সমূহের সমস্ত বিষয়-বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জামাতকে বুঝিয়ে বলা না হয়, আমরা পরবর্তী অপর কোন বিষয়ে যাব না। অতএব, আজ ওখান থেকেই আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করা হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "যখন মানুষ কোন সৎ-সত্যপরায়ণ ব্যক্তির সান্নিধ্যে বসে, তখন সত্যপরায়ণতা (সিদ্‌ক) তার মাঝে ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু যারা সত্যবাদীদের সাহচর্য ত্যাগ করে অসৎ লোকের সংসর্গ অবলম্বন করে তাদের ভেতরে পাপের প্রভাব গেড়ে বসে।" এখানে তিনি যে "যারা বসে" কথাটি বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যে, কোন কোন পুণ্যের সরাসরি প্রভাব অন্যান্যদের উপর পড়ে থাকে, সে-ক্ষেত্রে কোন কথোপকথন ও উপদেশেরও প্রয়োজন হয় না। যদিও কথোপকথনও হয়ে থাকে এবং নেকী ও খোদা-ভীরুতার (-তাকওয়ার) বিষয়-বস্তু মানুষেরা সত্যপরায়ণদের কাছে তাঁদের কথোপকথনের দ্বারাও শিখে থাকে, কিন্তু এস্থলে প্রথম যে কথাটি লক্ষণীয় তা হলো, "যখন বসে, তখন সত্যপরায়ণতা কার্যকর হয়।" এটা বাস্তব ঘটনা, আমরা তা অনেক অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, যখন আপনারা কোন নেক ব্যক্তির সাহচর্যে বসেন, তখন তার নেক ধ্যান-ধারণা আপনাদের ভেতর আপনা-আপনি প্রভাব ফেলতে থাকে। কৈশোরকালে প্রায়শঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের সংসর্গে আমার বসার সুযোগ ঘটেছে। বহু এরূপ সাহাবা ছিলেন যারা নীরব থাকতেন এবং তাঁদের কাছে এসে বসাতেই অন্তরে পুণ্য (প্রেরণা) বৃদ্ধি লাভ করতো এবং খোদাতাআলার দিকে হৃদয়ের ঝোঁক বেড়ে যেত। অতএব, এই নীরবতাও কথা বলতো। কিন্তু তা ছাড়াও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ বিষয়-বস্তুও বর্ণনা করেন যে, "তারপর, সত্যপরায়ণ ব্যক্তিরা যখন কথা-বার্তা বলেন, তখন মানুষ তা থেকেও অনেক ফায়দা লাভ করে। কিন্তু তাদের সাহচর্য ছেড়ে মানুষ যখন দুর্জনদের সংসর্গ অবলম্বন করে, তখন তাদের ওপর পাপ ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।" এ বিষয়টি আমি বহুবার বর্ণনা করে এসেছি- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ালের (রাঃ) বরাতেও যেমন, এক ব্যক্তি যার অন্তরে নাস্তিক্যের ধ্যান-ধারণার প্রকোপ ঘটতে আরম্ভ করেছিল, তাকে তিনি (রাঃ), যার সঙ্গে সে বাস করতো বা নামায আদায় করতো সে-স্থান ও সঙ্গ বদলের জন্য বল্‌লেন । তা পালন করার পর সে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যায় বলে জানিয়েছিল। কাজেই বদ খেয়ালের বা কুমনোবৃত্তির মানুষ নিশ্চয় কুপ্রভাব ফেলে। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "সেজন্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে কুসংসর্গ ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করার এবং তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকীদ এবং কঠোর সতর্কবাণী বিদ্যমান, লেখা রয়েছে যে, **যেখানে আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)-এর অবমাননা করা হয়, ওরূপ আসর বা বৈঠক-সমাবেশ থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে যাও। নইলে, অবমাননা শুনেও যে উঠে যায় না, সে-ও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।**" অসৎসঙ্গ থেকে যত দূরে সরে থাকতে পার ততই ভালো। 'কঠোর সতর্কবাণীর অর্থ হচ্ছে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ 'ইন্‌যার' (ভীতিপ্রদর্শন) করা হয়েছে এই বলে যে, যদি তোমরা দুষ্টদের সঙ্গ ত্যাগে বিরত না হও, তাহলে তোমাদের খারাপ পরিণতি হবে। "এবং লিখা আছে যে, যেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের অবমাননা সংঘটিত হয় সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে আস। কেন না, যে ব্যক্তি অবমাননা শুনেও ওঠে না, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।" এ বিষয়টি আমি পূর্বেও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যে, যেখান থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে যাবার পর অবমাননাকারী সেই আসরে পুনরায় যাবার খেয়ালই বা কী করে সম্ভব হতে পারে? এ বিষয়-বস্তুটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও বর্ণনা করছেন। এখন পুনরায় আমিও বলছি যে, আমাদের জন্য এটা অতি জরুরী বিষয়। এ বিষয়টিকে অত্যন্ত কঠোরভাবে আমাদের (প্রাত্যহিক) জীবনে প্রবর্তন ও বলবৎ করা উচিত। এমনি ধারায় ইনশাআল্লাহ্ এটা আমাদের জামাতের তরবীয়তের ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হবে। তিনি (আঃ) বলেছেন, "সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণদের সাহচর্যে অবস্থানকারীগণও তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। সেজন্য মানুষের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় যে, "কূনূ মায়াস্ সদেক্বীন" (-সত্যপরায়ণদের সঙ্গী হও) এই পবিত্র নির্দেশটির ওপর যেন সে বদ্ধপরিকর হয়, আমল করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা ফিরিশ্‌তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠান। এখানে উল্লেখিত 'পাঠান' কথাটির বিস্তারিত (তাত্ত্বিক) বিবরণে যাবার প্রয়োজন নেই। কেননা, যেহেতু এমন কোন রূহানী সত্তা নেই, যা দৈহিকও হয়ে থাকে এবং একখান থেকে আরেকখানে স্থানান্তরিতও হতে থাকে। কাজেই এসব অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়-বস্তু, যা হৃদয়ঙ্গম করা

সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) আমাদেরকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে এরূপ ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা আমরা সহজে বুঝতে পারি। বস্তুতঃ কেউ উর্ধ্বলোক থেকে নেমে কোন সভা-সমাবেশে এসে বসে পড়ে– ফিরিশ্‌তাগণ ওরূপ কার্যাদি তো করেন না। এই বিষয়-বস্তু হুযূর আকরম (সঃ) অন্যত্র সুস্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেছেন। তদুপরি কুরআন করীম এ বিষয়ের উপর বিশদ আলোকপাত করেছে। কিন্তু এ হাদীসটিতে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মুখনিঃসৃত এ কথাগুলো যে বাগধারায় বর্ণিত হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে অন্তরে যে প্রভাব পড়ে বা প্রতিফলিত হয়, তা হৃদয়ঙ্গম করুন। বাহ্যিক দৃশ্যগত বিবরণ ও কল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। এখন শ্রবণ করুন, "তারা (ফিরিশ্‌তারা) পবিত্র লোকদের মাহ্‌ফিলে আসে। আর যখন ফিরে যায়, তখন আল্লাহ্ তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন।" উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি এজন্যেই জরুরী ছিল যে, খোদা তো সেখানেও বিদ্যমান যেখানে পবিত্র ব্যক্তিরা রয়েছেন এবং সেখানে সংঘটিত সবকিছুই তিনি জানেন। তাই ফিরিশ্‌তারা আবার কোথায় ফিরে যান? কাজেই ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি রূহানী দৃশ্যের বর্ণনা মাত্র, যা মানুষ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। বস্তুতঃ ফিরিশ্‌তাদের উর্ধ্বাগমন সেখানেই হয়ে থাকে যেখানে সে মাহ্‌ফিল বসে এবং সেখানেই বিদ্যমান খোদাতাআলার দিকে তা এক রূহানী উর্ধ্বাগমন হয়ে থাকে। এই ব্যাখ্যার পর হাদীসটিতে বর্ণিত অত্যন্ত মর্মস্পর্শী উপদেশ বাণীটি এখন শ্রবণ করুন, "আল্লাহ্‌তাআলা জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কী দেখেছ?' তারা বলে, আমরা একটি মাহ্‌ফিল দেখেছি- সেখানে যারা তোমার 'যিক্‌র' করছিল। কিন্তু একজন লোক তাদের মধ্যকার ছিল না অর্থাৎ একটি লোক এরূপ ছিল, যে যিক্‌রকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তখন আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, 'না, সে লোকটিও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, 'ইন্নাহুম কওমুন লা ইয়াশ্‌কা জালীসুহুম'–তারা এরূপ এক জাতি বা দল যে, যে-কেউ তাদের সঙ্গী হয়, সে-ও বঞ্চিত ও হতভাগ্য হিসেবে থাকতে পারে না।" কতো মহান সুসংবাদ! কোন ব্যক্তি সরাসরি সাহচর্যের দ্বারা উপকৃত হবার সিদ্ধান্ত যদি না-ও করে এই নিয়্যত নিয়ে যদি না-ও বসে, বরং কোনও কারণ বশতঃ যেমন ওদিক দিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে ওখানে এমনি এসে বসে, সে-ও (ঐ মাহ্‌ফিলে যিক্‌রকারীদের দ্বারা) উপকৃত হয়।

হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ) বলেন, "এথেকে স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, সত্যপরায়ণদের সাহচর্যে কত উপকার (নির্ধারিত) রয়েছে। অত্যন্ত হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যে সত্যপরায়ণদের সাহচর্য থেকে দূরে সরে আছে। মোটকথা, 'নফ্‌সে মুত্‌মায়িন্নাহ্'র অন্যতম ইহাও যে, প্রশান্তিপ্রাপ্ত আত্মাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহচর্যের দ্বারা তারা প্রশান্তি লাভ করে থাকে।" 'নফ্‌সে মুত্‌মায়িন্নাহ্'প্রাপ্ত হচ্ছেন সে-ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌তাআলাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। অন্য দিকে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দ্বারা প্রশান্তি লাভের যে উল্লেখ রয়েছে, এর একটি ধরন হচ্ছে যে, ঐ সকল ব্যক্তির সাহচর্যে বসো যারা মূর্তিমান যিক্‌রস্বরূপ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁরা নফ্‌সে মুত্‌মায়িন্নাহ্‌র অধিকারী হয়েছেন। তাদের পক্ষে অন্য কারও মুখাপেক্ষী হবার কোন আবশ্যকতা থাকে না, বরং আল্লাহ্ তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং খোদাতাআলার সত্তার মাঝেই অবস্থান করেন তাঁরা। উল্লেখিত উদ্ধৃতিটিতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের সান্নিধ্যে এসে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে, স্বোয়াস্তি অনুভব করে থাকে। এটাও এক অভিজ্ঞতার বিষয়। এর সম্পর্কে আমি নিশ্চিৎ বিশ্বাস রাখি যে, আপনাদের মাঝে অনেকেরই অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে থাকবে যে, প্রশান্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে গিয়ে অন্তরে গভীর এক প্রশান্তি নেমে আসে। অতঃপর তিনি (আঃ) বলেন, "নফ্‌সে আম্মারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে কুপ্ররোচনা দানকারী আত্মার কুপ্রভাব"–যার অন্তর তাকে সবসময় পাপের দিকে প্ররোচণা দিতে থাকে তার কাছে যদি আপনারা বসেন তাহলে আপনাদের অন্তরেও অনুরূপ পাপের দিকে প্ররোচনা শুরু হয়ে যাবে। "এবং নফ্‌সে লাওওয়ামাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে পাপাচারের তীব্র অনুশোচনার প্রভাব।" যার কাছে আপনারা বসেন তার আত্মা যদি বারবার তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে তাহলে তার কাছে যে বসে সে-ও তার নিজের অন্তরে পাপাচারের প্রতি তিরস্কার ও ঘৃণার উদ্রেক হতে অনুভব করবে। "এবং যে-ব্যক্তি নফ্‌সে মুত্‌মায়িন্নাহ্‌সম্পন্ন ব্যক্তির সাহচর্যে বসে, তার ওপরও স্বস্তি ও প্রশান্তির আভাসসমূহ প্রস্ফুট হতে আরম্ভ করে এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে আশ্বাসিত হতে আরম্ভ করেন তাঁরা।" ইতোপূর্বে যদিও নফ্‌সে মুত্‌মায়িন্নাহ্‌র উল্লেখ এসে গেছে, এখন যেহেতু ক্রমধারায় উল্লেখ করছেন সেজন্যে শেষদিকে পুনরায় নফ্‌সে মুতমায়িন্নাহ্‌র উল্লেখ আবশ্যকীয় ছিল।

তিনি (আঃ) আরও বলেন, "সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাহচর্যে থাকা আবশ্যকীয়। অনেকে আছেন, যারা দূরে (সরে) বসে থাকেন এবং বলেন যে, কোন সময় কাছে আসবেন, উপস্থিত হবেন, আপাততঃ তাদের অবসর বা অবকাশ নেই। তেরশ' বছর হতে প্রতিশ্রুত সেলসেলা বা ঐশী- ব্যবস্থাটিকে পাওয়া সত্ত্বেও যারা এর সাহায্য-সহায়তায় শরীক (অংশীদার) হয় না এবং খোদা ও রসূলের (সঃ) প্রতিশ্রুত ব্যক্তির সান্নিধ্যে বসে না, তারা কি সফলতা লাভ করতে পারে? কখনও না।" অর্থাৎ দূরের বয়াত এই অর্থে যে, **বয়াত গ্রহণ করার পরে যারা দূরেই বসে থাকে ওরূপ করার দরুন তারা সফলতা লাভ করতে পারে না।** এখন যে যুগটি এসেছে এবং এমন দিনও আসবে যখন প্রতিবছরই আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে কোটি কোটি লোক এই জামাতে দাখিল হবে। এমনতর অবস্থায় কী ক'রে সম্ভব যে, তারা সবাই এখানে (-যুগ-খলীফার সান্নিধ্যে) এসে সমবেত হতে পারে? ছোট কোন একটি মসজিদে, অথবা বড়ো এই মসজিদটিতে, যেখানে এখন আমি আছি, তাদের সকলের সমবেত হওয়া অসম্ভব। যে-ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং যখনই যিনি করে থাকবেন, সারা বিশ্বের কোটি কোটি লোক যেন তার কাছে উপস্থিত হন, যদি না হন তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উল্লেখিত ফতওয়া প্রযোজ্য হয় যে, কখনও তারা সফলতা লাভ করতে পারে না। এমন অবস্থায় আজ আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এম-টি-এ (মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া) দান করেছেন। এর দরুন, যারা দূরে আছেন তাদের কাছে হুবহু এমনই অনুভব হয় যেন তারা এখানে উপস্থিত, এই সমাবেশেই বসে আছেন। দুনিয়ার যে-কোন অঞ্চলেই তারা বাস করুন না কেন, তাদের কাছে এই সব সমাবেশ ও অনুষ্ঠানেই বসে আছেন বলে মনে হয়। অন্য কোথাও আছেন বলে তাদের মনে তখন রেখাপাত করে না। এইসব অনুষ্ঠানে সেই অনুভূতি নিয়েই তারা (স্ব স্ব স্থানে) বসেন যে-অনুভূতি নিয়ে আপনারা উপস্থিত থাকেন। অনেক চিঠি-পত্র আমি পেয়ে থাকি, তাঁরা লিখেন যে, ওসব অবস্থায় তারা সম্পূর্ণ নিজেদের হারিয়ে ফেলেন। এমন কি, ছোট বাচ্চারা উঠে এসে টি-ভির পর্দায় আঙ্গুল ধরে। একজন বালিকা লিখেছে, তার মা 'আলায় সল্লাহু

বেকাফিন আব্দাহু' এর কী অর্থ এবং এই আংটি কেন পরা হয় সে-সম্পর্কে সব বিষয় তাকে বুঝিয়ে দেন। তেমনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যে আংটি আমি পরিধান করে থাকি সে-বৃত্তান্তও তার মা তাকে শোনালেন। সে লিখেছে, "(টি-ভি'র পর্দায়) সে- আংটির দিকে দেখামাত্র আমি দৌড়ে গেলাম এবং সেখানে আঙ্গুল ধরলাম যাতে ঐ আংটিটিকে চুমু দিতে পারি।" অতএব, এসব কোন বানোয়াট ব্যাপার নয়, বরং এগুলো হচ্ছে প্রীতি ও ভালোবাসার অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের নিদর্শনস্বরূপ, যা আহ্মদীয়া জামাতকে আল্লাহ্তাআলা দেখাচ্ছেন। কাজেই, এই ধারণা যে, দূরে বসে আমরা কী করবো? এ প্রসঙ্গে দূরে বসে অন্ততঃ খুতবা শোনারই যদি তারা নিয়মিত ব্যবস্থা কার্যকর করেন, তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই পবিত্র ইচ্ছাটি পূরণ হয় যে, "তাঁরা আসুন এবং সাহচর্যের দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হোন।"

তিনি (আঃ) বলেন, "তোমরা খোদারও অভিলাষী হবে এবং দুনিয়ারও ওরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অবান্তর, অসম্ভব এবং উন্মাদনা মাত্র।" এই বিষয় দু'টো অঙ্গাঙ্গিভাবে চলতে পারে না। যদি খোদাকে চান তাহলে খোদাকে চাওয়ার যে-সব দাবী ও মাত্রা তা পূরণ করুন। আর যদি দুনিয়া কামনা করেন তাহলে দুনিয়ার দিকে মুখ করে নিন। কিন্তু উভয়ের মাঝা-মাঝি পথ অবলম্বন করা যায় না। **দুনিয়া কামনা করতে গিয়ে যদি খোদাতাআলাকে পেতে চাও তাহলে অবধারিত-ভাবে ক্রমে ক্রমে দুনিয়া থেকে দূরে সরা এবং খোদার দিকে এগিয়ে যাওয়া আবশ্যকীয় বটে।** তিনি বলেন, "দীন তো চায় যেন সাহচর্য হয়, তবু যদি সাহচর্য থেকে বিমুখতা থাকে তাহলে দীনদারী হাসিলের আশা-ই-বা কেন রাখে? আমি বারংবার আমার বন্ধুদেরকে (-অনুসারীদেরকে) উপদেশ দিয়েছি, আবারও বলছি যে, **তারা বার বার এখানে এসে থাকুন এবং ফায়দা লাভ করুন (উপকৃত হোন)। কিন্তু এদিকে খুবই কম মনোযোগ দেয়া হয়। লোকেরা হাতে হাত দিয়ে দীনকে দুনিয়ার ওপর অগ্রগণ্য (করার অঙ্গীকার) করে যান কিন্তু এর কোন পরোয়া করেন না (তা বাস্তবায়নে যত্নবান হন না)।** বস্তুতঃ যারা আমার কাছে পর্যাপ্তভাবে অবস্থান করেন না এবং যেসব বিষয় প্রত্যহ আল্লাহ্তাআলা তাঁর সিলসিলার সমর্থনে প্রকাশ করে থাকেন ওসব বিষয় যারা শিখেন না এবং প্রত্যক্ষ করেন না, তারা নিজেদের জায়গায় কতো পুণ্যবান ও মুত্তাকী-পরহেযগার হোন না কেন, আমি তবুও বলবো যে, যথাযথভাবে তারা কদর করেন নি।" এই কথাগুলো বলেছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ যুগে যখন আহমদীয়তের সূচনামাত্র এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সম্পর্কে (সাধারণভাবে) মানুষের পুরোপুরি অনুভূতি ও সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। দূরে বসে, কখনও প্লেগের (নিদর্শনের) প্রভাবে বা অন্যান্য প্রভাবে তারা বয়াত তো করেছিলেন, কিন্তু (ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না আসার দরুন) তাদের অভ্যন্তরে তেমন অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে নি, যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণে কাদিয়ান চলে আসেন। ওরূপ লোকদের উদাসীনতার জন্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আক্ষেপ করেছেন বলে আজ আপনারা এমন বোকামির শিকার হবেন না এই ভেবে যে, আজ নবাগতরা উল্লেখিত পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক ভাল, আর তাই আপনাদের এই যুগ পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক ভাল, আর তাই আপনাদের এই যুগ পূর্ববর্তী ঐ যুগের ওপর শ্রেষ্ঠতা রাখে। যদি শ্রেষ্ঠতরই হয়ে থাকে তাহলে যে দরদ, যে ব্যথা-বেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল, যা তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সে মর্মবেদনাই ছিল, যা আল্লাহ্তাআলা কবুল করেছেন। অতএব, আমরা একশ' ভাগ তাঁরই পাদুকা বহনকারী দাসানুদাস, এবং আজ যেসব বিস্ময়াতীত মো'জেযা ও নিদর্শনাবলী আমরা দেখতে পাচ্ছি তা সবই তাঁর ঐ দোয়ারই ফলশ্রুতিস্বরূপ। এ কথাটি যদি কেউ বিস্মৃত হয় বা উপেক্ষা করে তাহলে সে নিতান্ত নির্বোধ বলেই সাব্যস্ত হবে এবং সে সম্পূর্ণ বাতিল ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত হয়ে নিজের দীন ও ঈমান খোয়াতে পারে। (হুযূর উদ্ধৃতিটির এটুকু অংশ পুনরায় পাঠ করে শোনান) এর পরবর্তী অংশটুকু হচ্ছে, 'পূর্বে আমি বলে এসেছি যে, জ্ঞানগত চাহিদার পূর্ণতালাভের পর আমল বা কর্মগত চাহিদার পূর্ণতা সাধনের আবশ্যকতা রয়েছে। অতএব, **কর্মের পূর্ণতা, জ্ঞানের পূর্ণতা ব্যতিরেকে অসম্ভব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এখানে এসে না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানগত চাহিদাপূরণ কঠিন বটে।** বারবার (বিভিন্ন লোকের) চিঠিপত্র আসে যে, অমুক ব্যক্তি আপত্তি করেছে, উহার উত্তর তারা দিতে পারেন নি। এর কারণ কী? এ জন্যেই যে, ঐ সমস্ত লোক এখানে আসেন না। ঐসব কথা তারা শোনেন না, যা খোদাতাআলা তাঁর সিলসিলার সমর্থনে জ্ঞানের ধারায় প্রকাশিত করছেন। সত্যিকারভাবে যদি তোমরা এই সিলসিলাকে সনাক্ত করে থাক এবং খোদার উপর ঈমান আনয়ন এবং দীনকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দানের প্রকৃত অঙ্গীকার করে থাক, তাহলে আমার জিজ্ঞাসা-এর ওপর কী আমল করা হয়? 'কূনূ মায়াস্ সদেক্বীন' সম্বলিত আদেশটি কি মন্সুখ (রহিত) হয়ে গেছে? যদি সত্যিকারভাবে তোমরা ঈমান এনে থাক তাহলে প্রকৃত সৌভাগ্য এটাই যে, খোদাতাআলাকে অগ্রগণ্য কর। যদি এই সব কথাকে বৃথা ও অনাবশ্যক বলে মনে কর তাহলে মনে রেখো, খোদাতাআলার সঙ্গে বিদ্রূপকারী বলে সাব্যস্ত হবে" (আল্ হাকাম, ৩১ম খণ্ড, ২৪ শে আগস্ট, ১৯০১ ইং)।

'জ্ঞানগত পূর্ণতা ব্যতিরেকে কর্মগত পূর্ণতা সাধিত হতে পারে না', আর তেমনি আপত্তি খণ্ডনে অনেকের অপারগতার যে বিষয়টির তিনি উল্লেখ করেছেন তা ধীর-স্থিরভাবে বোঝার আবশ্যকতা রয়েছে। বস্তুতঃ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাকাম ও মর্তবা এই ছিল যে, জ্ঞান বিতরণ ব্যতিরেকেও তিনি (সরাসরি) আত্ম-শুদ্ধি সাধন করতেন এবং অনুরূপ আত্ম-শুদ্ধির ধারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ও পুনঃপ্রবাহিত হয়। সুতরাং তাঁর লেখাটিতে প্রথম অংশ উক্ত বিষয় সম্পর্কেই অর্থাৎ যেখানে সান্নিধ্যে যারা বসে, সেখানে কথোপকথন ব্যতিরেকে তাদের ওপরে যে প্রভাব পড়ছে ও সেই বিষয়-বস্তুটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিস্মৃত হন নি। হয়তো তিনি জ্ঞানগত উন্নয়নকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে এখানে কারো মনে ধারণা উদ্রেক হতে পারে। সবচে' প্রথম কথাটি তিনি এই বর্ণনা করেছেন যে, **সৎ ও সত্যপরায়ণদের সাহচর্য যদি অবলম্বন কর তাহলে বিনা কথোপকথনও তোমাদের অন্তরে পুণ্যের সঞ্চার ঘটবে।** এটা বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ফয়েয ও কল্যাণ প্রবহমানতাই বটে যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত। পূর্ববর্তী রসূলদের মধ্যে এ বিষয়টির কথা কেউ শোনেন নি। থাকলেও অল্পস্বল্পই ছিল. কিন্তু সুনির্দিষ্টরূপে এর কোন উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না। আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা যে এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তা যদি কেবল তাঁর মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতো তাহলে ভবিষ্যতেও সব সময় সব যুগে তাঁর ফয়েয ও কল্যাণ কী করে বিস্তৃত

হতো? সেজন্য এই ফয়েয শুধু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমেই পৌঁছে নি বরং (ইতোপূর্বেও) অত্যন্ত বিপুলভাবে যে তা বিস্তৃত হতে আপনারা অবলোকন করেন তা বস্তুতঃ সদাত্মা ব্যক্তিদের সুপ্রভাব অন্যদের আত্মায়ও যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে, ইহা সে-বিষয়েরই স্বাক্ষর বহন করে। বস্তুতঃ ইহা সাধারণভাবেই ব্যপ্তি লাভ করে। এ বিষয়টি সবিস্তারে বিশদভাবে বর্ণনা করবার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সুষ্ঠু জ্ঞান দানের আবশ্যকতার বিষয়টিও বর্ণনা করেন, যেমন কিনা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে, "ওয়া ইউয়াল্লেমুহুল কিতাবা ওয়াল্ হিক্মাতা ওয়া ইন কানূ মিন কাবলু লাফি যালালিম্ মুবীন"–অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ 'তায্কিয়া-এ-নাফ্স' বা মানুষের আত্মশুদ্ধি সাধনের পর কিতাবের শিক্ষা দেন এবং কিতাবের হিকমত ও সূক্ষ্ম-তত্ত্বও বর্ণনা করেন। এই বিষয়-বস্তুটিই এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করছেন। তিনি বলছেন, 'জ্ঞানগত পূর্ণতার পর আমল বা কর্মগত পূর্ণতালাভের প্রয়োজন।" কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত না জ্ঞান আহরণে মানুষ উন্নতিলাভ করে,ততক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মা ঐসব কর্ম সম্পাদনে প্রস্তুত হয় না, যা জ্ঞানালোকের ফলশ্রুতিতে আপনা-আপনি প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাই তিনি বলেন যে, সৎকর্মশীল কীরূপে হবে তোমরা? যদি ঐসব জ্ঞান লাভ করতে না পার, যার ফলশ্রুতিতে আমল করার তওফীক দান করা হয়। যদি জ্ঞান সত্যিকার হয় এবং তা লাভ করার সৌভাগ্য হয়, তাহলে সেই জ্ঞান লাভের পর সৎকর্ম করা অবধারিত হয়ে পড়ে। হিকমতের এ বিষয়টি বোঝাবার দরকার ছিল। যখন আপনারা জানেন যে, অমুক জিনিসটি আপনাদের স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যকীয় তখন উহা আপনারা উপেক্ষা করতে পারেন না। বরং উৎসাহের সাথে তা লাভ করার চেষ্টা করবেন। এটাই আপনার জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ বহন করবে। মানুষের সব রকম চেষ্টা-প্রয়াস জ্ঞানের ফলশ্রুতিতেই হয়ে থাকে। তেমনি কোন জিনিস কারও জন্য খারাপ বলে যখন সে জানতে পারে তখন আপনা-আপনি তাথেকে সে দূরে সরে থাকতে চেষ্টা করে। অতএব, **কর্মের পূর্ণতা সাধন জ্ঞানের পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক জ্ঞান আবার উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং জ্ঞানের এই উন্নতির সাথে সৎ কাজেরও উন্মেষ ঘটে। হিকমতের এই তত্ত্বটিই উক্ত উদ্ধৃতিটিতে বর্ণিত হয়েছে।** অতঃপর তিনি বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এখানে এসে (সাহচর্যে) না থাক, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ কঠিন বটে। অতএব 'এখানে এসে সাহচর্যে থাকার, জবাব তো আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এম-টি-এ-র মাধ্যমে দান করেছেন। এরপর তিনি বলছেন, 'বার বার এই বলে চিঠি-পত্র আসে, অমুক বিরুদ্ধবাদী আপত্তি করেছে তার উত্তর তারা দিতে পারেনি। অনুরূপ ঘটনা এখনও হয়। ওরূপ প্রত্যেক প্রশ্নকারীকে আমি জওয়াব দিয়ে থাকি যে, আপনি যদি এ যাবৎ এম-টি-এর মাধ্যমে প্রচারিত ঐসব প্রশ্ন-উত্তরমূলক প্রোগ্রাম শ্রবণ করে থাকতেন, যেগুলোতে সব রকম প্রশ্নের উপর বহুবার বিভিন্নভাবে পর্যাপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে–তবে আমি শঙ্কিত যে, ঐ সমস্ত বিপুল সংখ্যক ক্যাসেট আর কী করে শুনতে পারবেন–কিন্তু সুনিশ্চিৎ সেগুলোর মধ্য থেকে যখনই শুনবেন এবং যতটুকুই শুনবেন তাতে আপনারা দেখে আল্লাহ্তাআলার ফযলে বিস্মিত হবেন যে, কোন বিরুদ্ধবাদীর এমন কোন আপত্তির লেশমাত্রও বাকী থেকে যায় নি, যা খণ্ডনে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা হয়নি। তা সত্ত্বেও অনেক পত্র মারফত আমাদেরকে জবাব লিখে পাঠাতে বলা হয়। আমি বলছি যে, আমার পক্ষে তো একেবারেই সম্ভব নয় যে, আমি আপনাদের পত্রের উত্তর দশ হাজার পৃষ্ঠার একটি বই পাঠাই বা নতুন করে লিখাই। ঐ সমস্ত বিষয় যা একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেগুলোকে 'তরজুমাতুল কুরআন' অনুষ্ঠানসহ (কেননা, তাতেও বহুরকম তত্ত্ব-তথ্য বর্ণিত হয়ে থাকে) এমনকি 'বাচ্চাদের প্রোগ্রাম'সহ যদি সবিস্তারে সকল জামাত ও মজলিসে পরিবেশন করা হয় তাহলে উল্লেখিত বিষয়গুলো সব মিলিয়ে কমপক্ষে হলেও দশহাজার পৃষ্ঠায় দাঁড়াবে। কাজেই এটা কী করে সম্ভব? তাঁদের এহেন প্রশ্ন অদ্ভুত নয় কি? এ সম্পর্কে অজ্ঞতা এতো যে, জানাই নেই যে, এই সব আপত্তিরই সবিস্তারে জবাব দেয়া হয়েছে (যা ক্যাসেটে সন্নিবেশিত রয়েছে)। পাকিস্তান থেকে কোন বাচ্চা পত্র দেয়– শিয়ালকোটের কোন গ্রাম থেকে যে, তাকে এই এই প্রশ্নের জবাব নিজের হতে লিখে পাঠান হোক। সেগুলোর এক-একটি প্রশ্ন এরূপ যে, এর উত্তরে আমাকে অন্ততঃ এক এক হাজার পৃষ্ঠার বই লিখতে হবে, অথবা লিখাতে হবে। কাজেই, এসব বালসুলভ কথা-বার্তা পরিত্যগ করুন। বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে দেখুন, বিশদ উত্তর স্বরূপ সব বিষয় আপনাদের হাতের কাছে সহজলভ্য রয়েছে। যার এটাই জানা নেই, তার জ্ঞানগত চাহিদা পুরণ কীরূপে সাধিত হবে? সেজন্য জামাতসমূহে এই জ্ঞানভান্ডার সম্পর্কে সাধারণভাবে জানানো এবং সচেতন করা অবশ্যকীয়। ব্যাপকভাবে এই জ্ঞানের প্রসার ঘটান। সবাইকে বলুন, সব রকম আপত্তির খণ্ডন মজুদ রয়েছে। তাদেরকে কেবল নিজেদের জামাতের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এটুকু লিখতে হবে যে, তাদের এই এই প্রশ্ন, এগুলোর উত্তর কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে। খোদাতাআলার ফযলে সংশ্লিষ্ট ঐ বিভাগ তাদেরকে তা অবহিত করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে এমনটি ধরে নিবেন না যে, কোনও একটি প্রশ্নসম্পর্কিত সব বিষয় একটি ক্যাসেটেই এসে যাবে। এর জন্য ২০,২৫ এমনকি ৪০ ক্যাসেট এরূপ থাকতে পারে, যেগুলোতে বিস্তারিত বিবরণ মজুদ রয়েছে। এবং প্রত্যেক ক্যাসেটে কিছু না কিছু নতুন তত্ত্ব-তথ্য বিদ্যমান। এদিকে নিজেদের সুযোগ-সামর্থ্য অনুযায়ী মনোনিবেশ করুন। যদি হাতে বেশী সময় থাকে তবে বেশী সময় দিন, কম হলে কমই। আপনাদেরকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, সব ধরনের আপত্তি খণ্ডনে আপনারা দক্ষতায় ভূষিত হবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'প্রায়শঃ এই মর্মে চিঠিপত্র আসে যে, অমুক ব্যক্তি আপত্তি পেশ করেছে যে, উহার উত্তর দিতে তারা পারেনি। এর কারণ কী? এজন্যেই যে, তারা এখানে উপস্থিত হন না, ঐ সমস্ত কথা তারা শোনেন না যা খোদাতাআলা তাঁর সিলসিলার সমর্থনে জ্ঞানের ধারায় প্রকশিত করে চলেছেন। সত্যিকার অর্থে যদি তোমরা এই সিলসিলাকে সনাক্ত করে যাক এবং খোদার উপর ঈমান আনয়ন ও দীনকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দানের যথার্থ অঙ্গীকার করে থাক, তাহলে আমার জিজ্ঞাসা, এর ওপর কী আমল করা হয়? 'কূনূ মায়াস্ সাদেকীন' (সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন কর) -সম্বলিত আদেশটি কি মনসূখ (রহিত) হয়ে গেছে?"

উক্ত বিষয়টিরই বিস্তারিত আলোচনায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'সাদেক' (সত্যবাদী) বলতে কী বুঝায় এবং ইসলামী পরিভাষায় কতো ব্যাপক অর্থ বহন করে সে-সম্পর্কে বলেন, "সাদেক (সত্যবাদী) বলতে মানুষ মুখ দিয়ে মিথ্যা বলে না শুধু এটুকুই বুঝায়

না। এটা তো হিন্দু এবং নাস্তিকদের মাঝেও থাকতে পারে।" এটা বাস্তব ঘটনা, আমি নিজেও বহুবার এরূপ হিন্দু এবং পশ্চিমা নাস্তিকদের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাদের মধ্যে এই গুণ পরিলক্ষিত হয় যে, মুখ দিয়ে তারা মিথ্যা বলেন না। অর্থাৎ কথা তারা সব সময় সত্যই বলেন, কিন্তু যখন বলেন তখন তা তাদের কর্মে রূপান্তরিত হয় সে অর্থে বলেন না। এই পার্থক্যটিই বিদ্যমান মু'মিন সত্যবাদী এবং অ-মু'মিন সত্যবাদীর মাঝে। অ-মুমেন যে সত্যবাদী, সে হাজার সত্য কথা বল্‌লেও মন থেকে সে জানে যে, তা পালন করা তার পক্ষে কঠিন – কার্যতঃ সে তা পালন করতে পারবে না। সুতরাং ঐ সব সাক্ষাৎকারে তারা প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করেন, 'সম্পূর্ণ সঠিক কথা বলেছেন, এটাই ইসলামের শিক্ষা হওয়া উচিত।' কিন্তু তাদের চেহারাতেই স্পষ্টতঃ উদ্‌ভাসিত হয় যে, তারা তা গ্রহণ ও পালন করতে পারবেন না। তাই তিনি বলেন, "বরং 'সাদেক' বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যার প্রত্যেকটি কথা সত্য হওয়া ব্যতীত তার সমস্ত আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কথা-বার্তা সবকিছুই সত্যতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত যে, তাদের সম্পূর্ণ সত্তাই যেন মূর্তিমান সত্যবাদিতার রূপ ধারণ করে।" এহেন সত্যবাদিতাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁর জামাতের মাঝে দেখতে চান, যা উক্ত উদ্ধৃতিটিতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, "সে যেন সম্পূর্ণ সত্যবাদিতায় পরিণত হয় এবং তার এই সত্যপরায়ণতার স্বপক্ষে বহুবিধ সমর্থনমূলক আসমানী নিদর্শন এবং অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ সাক্ষ্য প্রদান করে।" এই দ্বিতীয় দিকটি আগেও আমি খোলাসা ক'রে বর্ণনা করেছি, অধিকতর ব্যাখ্যায় এখন আর যেতে চাই না। শুধু এটুকু বুঝাতে চাই যে, এই সত্যবাদিতা কোন লুকানো ব্যাপার নয়। **আল্লাহ্ যাকে এই সত্যবাদিতা দান করেন তার সমর্থনে তিনি আবার নিদর্শনাবলী না দেখান, তেমনটি কখনও হতেই পারে না। এবং আল্লাহ্‌তাআলা যখন নিদর্শনাবলী প্রকাশিত করেন, দুনিয়া সেগুলো তখন অবলোকন করতে পারে। ওরূপ সত্যবাদী ব্যক্তিদের দোয়া গৃহীত হয়, আল্লাহ্ তাদেরকে ভবিষ্যতের সুসংবাদ দান করেন, শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন। আরও অসংখ্য পন্থায় আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর সত্যপরায়ণ বান্দাদের সাথে এরূপ এক সম্পর্ক রাখেন, যা সাক্ষ্যস্বরূপ সুপ্রকাশমান হয়। এবং তার আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে খোদাতাআলার ঐ সম্পর্কের দরুন মানুষে জানতে পারে যে, সে সাদেক (সত্যবাদী)।** উদ্ধৃতিটিতে উল্লেখিত 'খাওয়ারিক' (–অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ) দ্বারা এই বুঝায় যে, ওগুলো সাধারণ নিদর্শন নয় বরং এরূপ নিদর্শন হয়ে থাকে যা নিত্যকার প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। এতো অসাধারণ হয়ে থাকে যে, বিদ্বেষমুক্ত মানুষ মাত্রই তা কখনও অস্বীকার করতে পারে না। ওরূপ অজস্র 'খওয়ারেক' আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে দান করা হয় এবং ওরূপ 'খওয়ারেক' মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কেও দান করা হয়। যেমন, পাগলা-কুকুর দংশনের আব্দুল করীমের ওপর যে প্রতিক্রিয়া ছিল, এর পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারগণ বলে দিয়েছিলেন যে, তার কোন আর চিকিৎসা নেই অর্থাৎ জলাতঙ্ক যখন তার মধ্যে পুনরায় দেখা দিল তখন শীর্ষস্থানীয় ডাক্তারগণ জবাব দিলেন যে, Nothing can be done for poor Abdul Karim (poor শব্দটি বোধ হয় সেখানে নেই)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তখন তার জন্য দোয়া করলেন। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তাআলা জানিয়ে দিলেন যে, আব্দুল করীম সুস্থ হয়ে উঠবে। আজ পর্যন্ত আব্দুল করীমের বংশধরগণ হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্র) প্রদেশে মজুদ রয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে বিরাট সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের মাঝে প্রত্যেকেই জলজ্যান্ত সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে আছেন। একেই বলা হয় 'খওয়ারিক'। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তা শুধু নিজের জন্যই বলে নির্ধারণ করছেন না– এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য সুসংবাদ বিশেষ। তিনি বলেছেন, 'তোমরা সত্যপরায়ণ (–সাদেক) হও; তোমাদের স্বপক্ষেও আল্লাহ্ 'খওয়ারিক' দেখাবেন।' আর এই 'খওয়ারিক'-এর দৃষ্টান্ত ও চিহ্নাবলী আমিও আহ্‌মদীদের মাঝে প্রায়শঃ অবলোকন করে থাকি। বস্তুতঃপক্ষে এরূপ বহুসংখ্যক আহ্‌মদী রয়েছেন, যাদের স্বপক্ষে অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ তিনি দেখিয়ে চলেছেন। তারা জগতময় ছড়িয়ে আছে। অতএব, **ঐরূপ 'সাদেকে' পরিণত হতে সচেষ্ট হোন, যাদের জন্য খোদা তক্‌দীরকে সক্রিয় ও সচল করে থাকেন, যা মানবীয় চেষ্টা-তদ্বিরের ওপর প্রবল হয়ে থাকে। যদি আপনারা ঐরূপ সাদেক (–সত্যপরায়ণ) হয়ে যান, তাহলে আহ্‌মদীয়ত দুনিয়া জুড়ে কীরূপ শান ও মর্যাদার সাথে বিস্তারলাভ করে, তা আপনারা নিশ্চিৎ দেখতে পাবেন। আপনারা প্রত্যক্ষ করবেন দুনিয়া যে কতো দ্রুত সংশোধিত হয় এবং আহ্‌মদীয়তের দ্বারা জগতের কতো কল্যাণ সাধিত হয়।** অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, " যেহেতু সঙ্গ ও সান্নিধ্যের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী, সেহেতু সমস্ত আচার-আচরণে, কথায় ও কাজে যে ব্যক্তি খোদায়ী দৃষ্টান্ত ও ঐশী নমুনার ধারক ও বাহক হয়ে থাকেন, যে-কেউ তাঁর সান্নিধ্যে যথার্থ নিয়্যত, পবিত্র ইচ্ছা-বাসনা এবং সরল-সুদৃঢ় অনুসন্ধিৎসা সহকারে কিছুকাল (পর্যন্ত) অবস্থান করবে, আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, সে যদি নাস্তিকও হয়, তথাপি সে খোদাতাআলার অস্তিত্বে অবশ্যই জীবন্ত ঈমান লাভ করবে। কেননা, 'সাদেক' (–সত্যপরায়ণ ব্যক্তি) খোদার দর্পণ-স্বরূপ হয়ে থাকেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অসংখ্য নাস্তিকদের আরোগ্য দান করেছেন, যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে কিছুকাল অবস্থান করে এবং তাঁর মাধ্যমে খোদার মহিমা প্রদর্শন উপযোগী নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু যারা আসা মাত্র চলে যায় তাদের সংশোধন হওয়া তো সম্ভব নয়। তাদের তো সুযোগই ঘটেনি যাতে তারা নিজেরা সদ্য-সজীব, নিত্য-নতুন নিদর্শনাবলী অবলোকন করতো। অতএব, "যথার্থ নিয়্যত, পবিত্র ইচ্ছা-বাসনা এবং সরল-সুদৃঢ় অনুসন্ধিৎসা (–'মুস্তাকীম জুস্তুজু')"–এ বাক্যটিতে শেষোক্ত শব্দ-গুচ্ছ দ্বারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পূর্ণ নতুন একটি সুন্দর বাগ্‌ধারা প্রণয়ন করেছেন। কেননা, অনুসন্ধানের ভাসা-ভাসা ইচ্ছাও তো হতে পারে, হয়ে থাকেও। যেমন কেউ আসলো, তারপর ঝট্‌পট্ চলে গেলো, কিছুই দেখলো না, বুঝলো না– তার কী বা উপকার হতে পারে?! কিন্তু কোন বিষয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে – যেমন পুলিশ কোন ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ডের আলামত তালাশ করে বেড়ায়, ওটাকে বলা হয় 'মুস্তাকীম জুস্তুজু' (–সঠিক ও সুদৃঢ় অনুসন্ধান)। তারা ছাড়ে না ঐ স্থানটিকে যদিও দৃশ্যতঃ সেখানে কেবল ফাঁকা ময়দানই দেখা যায়, কোন আলামত (চিহ্ন) বাহ্যতঃ নেই সেখানে, তবুও ঘাসের পাতা গুলোকেই ওলট-পালট ক'রে ইস্তেকামাত ও দৃঢ়তার সাথে তারা দেখতে থাকে। অনেক সময় সহস্র সহস্র ব্যক্তি পুলিশের সাথে এই 'মুস্তাকীম জুস্তুজু' – অনুসন্ধান কাজে যোগ দেয়। অবশেষে তাদের

এই অব্যাহত চেষ্টা-প্রয়াস ফলপ্রসু হয়। তেমনি ধারায়, একজন মৎস-শিকারী সারা দিন, এমন কি কোন ক্ষেত্রে দিনের পর দিন সেখানে (বড়শী ধরে) বসে থাকে। তার অনুসন্ধিৎসা, যেন মাছ ধরা পড়ে। কোন সময় এক দিন পর অথবা কয়েক দিন পর একটা অনেক বড়ো মাছ ধরে ফেলে সে। এবং আজীবন গর্বের সাথে দেখিয়ে বেড়ায় এই বলে যে, এতো বিরাট একটি মাছ আমি ধরেছিলাম। ঐ মাছটি তো সে আর দেখাতে পারে না, কিন্তু ওটার এক কাঠামো তৈরী ক'রে (বা নকশা এঁকে) দেয়ালে সাজিয়ে দেয়। অতএব– এহেন চেষ্টা-প্রয়াসকে 'মুস্তাকীম জুস্তুজু' বলা হয়। বস্তুতঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, 'পবিত্র নিয়্যত ও ইচ্ছা-বাসনার পাশাপাশি অনুসন্ধান 'মুস্তাকীম'-সরল-সুদৃঢ় হতে হবে। আমি যে বলি, খোদা আমাকে নিদর্শন দান করেন, উহার মূল্য সত্যানুসন্ধানকারীর দৃষ্টিতে একজন মৎসশিকারী এবং পুলিশের চেয়ে অধিক হওয়া উচিত। এতো বড় মহান সত্তার সন্ধান দানের কথা আমি ঘোষণা করছি, কিন্তু কেউ যদি আসে, আর চলে যায়, তাহলে ওটা তার পক্ষে অত্যন্ত বোকামীর কাজ হবে। তার উচিত সে যেন ধীর-স্থিরে অবস্থান করে, গভীর দৃষ্টি দিয়ে সব বিষয় দেখতে থাকে এবং চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে যে, কীরূপ নিদর্শন দেখানো হচ্ছে। যখন সে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখবে, তখন তার কাছে অসংখ্য উজ্জল নিদর্শনাবলী পরিলক্ষিত হবে।' মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "আমি পরিপূর্ণ ও সুনিশ্চিৎ দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, সে যদি নাস্তিকও হয়ে থাকে, অবশেষে সে অবশ্যই ঈমান আনবে। কেননা, সত্যবাদীর সত্তা খোদার দর্পণস্বরূপ হয়ে থাকে।" অর্থাৎ তার মাধ্যমে সে অবশ্যই খোদাকে দর্শন করে।

অতঃপর তিনি বলেন, "ইন্সান – শব্দটি আসলে হচ্ছে 'উন্সান', অর্থাৎ দু'টি ভালবাসার আকর বা সমষ্টি।" 'উন্স' অর্থ ভালবাসা বা প্রীতি। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, 'ইন্সান' আসলে 'উন্সান' (–দু'টো ভালবাসা), যা বহুল ব্যবহারের দরুন 'ইনসানে' রূপান্তরিত হয়েছে। এটা আরবী ভাষার নিয়ম যে, বহুল ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব শক্ত হারাকাত (ধ্বনি-সংকেত), হাল্কা সংকেতে বদলে যায়। সবচে' হাল্কাটি হচ্ছে 'যের'। 'উন্স' –শব্দটিতে যে 'পেশ' রয়েছে এটা সবচে' কঠিন। এর কম কঠিনটি হচ্ছে 'যবর'। 'যের' হচ্ছে উচ্চারণে সবচে' সহজ। অতএব, আসলে যা 'উনসান' ছিল তা 'ইনসানে' রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু অর্থ ওটাই বহন করে, অর্থাৎ দু'টি ভালবাসার সমষ্টি। মসীহ্ মাওউদ বলেন, "একটি ভালবাসা সে খোদার সাথে করে থাকে এবং আরেকটি মানুষের সাথে। যেহেতু মানুষকে সে তার নিকটেই পায় এবং (বনী আদম হিসেবে) নিজের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেজন্য পূর্ণ মানবের (–কামেল ইনসানের) সংস্পর্শ এবং সত্যপরায়ণ ব্যক্তির সাহচর্য তাকে সেই 'নূর' দান করে যদ্বারা সে খোদার দর্শন লাভ করে এবং পাপাচার থেকে রক্ষা পায়।" মানব-স্বভাবে আল্লাহ্রও ভালবাসা নিহিত আছে এবং মানুষের প্রতিও ভালবাসা রয়েছে। কিন্তু খোদাতাআলাকে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করতে পারে না। আর নিজের শ্রেণীভুক্ত হবার দরুন মানুষকে অনায়াশে দেখে এবং তার দ্বারা ঝট্পট প্রভাবিত হয়। কেননা, নিকটের বস্তু নিশ্চয় প্রভাব ফেলে থাকে এবং দূরের বস্তু ক্রমে ক্রমে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে, অথবা প্রভাব থাকলেও স্পষ্টতঃ অনুভূত হয় না। পাঞ্জাবী ভাষায় মানুষে বলে থাকে, যা অত্যন্ত নিঃরস ধরনের একটা দৃষ্টান্ত বটে, এই বলে যে, "খোদা নেড়ে কেহ্ কসোন্দ্? অর্থাৎ, তুমি যে খোদাকে ভয় পেয়ে ফির, দেখ! মুষ্টাঘাত বা ঘুষি কাছে, না খোদা কাছে? এটা নিতান্ত অজ্ঞতাপূর্ণ কথা। কিন্তু এ কথাটির মূলেও সত্য অবশ্য বিদ্যমান। কেননা, অধিকাংশ মানুষ, যাদের কাছে খোদা পরিলক্ষিত হন না, যেমন পাকিস্তান এবং অন্যান্য সবখানেই তাদের অবস্থা ওরূপই দেখা যায় যে, তারা ঘুষিকে ভয় করে, খোদাকে করে না। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "নিজের শ্রেণীভুক্ত হবার দরুন সে তার নিকটবর্তী মানুষের কাছে প্রভাবিত হয়। সেজন্য কামেল ইনসানের সহবত এবং সত্যপরায়ণ (–সাদেক) ব্যক্তির সাহচর্য তাকে সেই নূর দান করে, যা তার জন্য খোদার দর্শনলাভের কারণ হয় এবং সে পাপাচার থেকে রক্ষা পায়।

অতএব, সত্যপরায়ণ ব্যক্তির সাহচর্যে – যদি তা যথার্থ সাহচর্য হয় – সে (ভক্ত) এরূপ পুণ্যবান ব্যক্তিকেই অবলোকন করে, যিনি হয়ে থাকেন খোদার দর্পণ ও দিকনির্দেশকস্বরূপ। কাজেই তার দৃষ্টি সেখানেই নিবদ্ধ হয়ে থেমে যেতো না (বরং আরো উর্ধ্বে– দীদারে ইলাহীর দিকে উঠতো)। এ সব কথা পূর্বেও আমি খোলাসা ক'রে বর্ণনা করেছি যে, যে-সব লোক পীর-পূজাপ্রবণ (–যারা শির্কের পর্যায়ে পীরভক্ত), তারা প্রকৃতপক্ষে সত্যপরায়ণ ও পুণ্যবান ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বনের যোগ্যতাই রাখে না। তাদের চোখে কেবল পীরই পরিদৃষ্ট হয়। অথচ সে-পীর যদি সত্যিকার পীরই হতো, তাহলে হয়তো তার অঙ্গুলি-নির্দেশ আদৌ খোদার দিকে ছিল না – নচেৎ, যদি হতো তবে এই নির্বোধ (ভক্ত) তার পীর প্রবণতার দরুন সেই অঙ্গুলিনির্দেশ অনুধাবন করতে অক্ষম ছিল। (কেননা) তার চোখ সেখানে গিয়ে স্থির হলো, যা কাম্য (ও প্রকৃত লক্ষ্য-বস্তুস্বরূপ) ছিল না। তার দৃষ্টি উপরের দিকে ওঠা উচিত ছিল। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উভয়ের প্রকৃত ও যথার্থ সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিও এরূপ (হতে হবে), যাঁর সাহচর্য 'নূর' (–খোদা-দর্শনের আলো) দান করে এবং খোদাকে দেখিয়ে দেয়। আর প্রত্যাশী ব্যক্তিও 'সরল-সুদৃঢ়' অনুসন্ধিৎসা (–'মুস্তাকীম জুস্তুজু') সহকারে প্রত্যাশী হয়ে সেই পুণ্যবান ব্যক্তির মাধ্যমে খোদাকে অবলোকন করে। সেই পুণ্যবান সত্তাতেই যেন তার চোখ থেমে না যায়।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "এবং পাপাচার থেকে রক্ষা পায়।" এই রক্ষা পাওয়ার উপায় ও পন্থা কী? যখন আপনি একজন দ্রষ্টাকে দেখতে পাচ্ছেন, যিনি আপনার সব অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখেন, তখন অবধারিতভাবে পাপাচার থেকে আপনি রক্ষা পাবেন। (আল্ হাকাম ৫ম খণ্ড, ৪৪তম সংখ্যা, ৩০শে নভেম্বর ১৯০১ ইং)

অতঃপর তিনি (আঃ) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত, বয়াতের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি ইহাও যে, তাকওয়া বা খোদা-ভীরুতা যা প্রাথমিক অবস্থায় চেষ্টা প্রয়াসের ধারায় এক প্রকার কৃত্রিম উপায়ে অবলম্বন করা হয় তা যেন আরেক রূপ ধারণ করে এবং সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের (আত্মিক) দৃষ্টি এবং সিদ্ধপুরুষদের প্রবল অনুভূতি ও আকর্ষণী-শক্তির সুবাদে তাকওয়া যেন স্বভাবের সাথে মিশে গিয়ে উহারই (অবিচ্ছেদ্য) অংশস্বরূপ হয়ে যায়।"

এই উদ্ধৃতিটি কিছু কঠিন বলে মনে হয়। কেননা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোন সময় কিছু কিছু পরিভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হন, তাতে অল্প কথায় অনেক ব্যাপক বিষয় মানুষের কাছে পৌছাতে

চান। এই ধারায় এখানে আরবী ভাষার কিছু শব্দ রয়েছে বিধায় ওলামার পক্ষেও তা বুঝা কিছুটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য আমি এর দ্বারা কী বুঝায় তা একটু খোলাসা ক'রে বলতে চাই। তিনি বলছেন যে, তাকওয়ার প্রারম্ভিক অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ অবস্থায় রূপান্তরিত না হয়, যা ইহার অপর একটি রূপ, ততক্ষণ পর্যন্ত (তাকওয়া অবলম্বনের) এই চেষ্টা-প্রয়াস ও সাধ্য-সাধনা অব্যাহত থাকা উচিত। তারপর সে অপর রূপটি হচ্ছে **তাকওয়াকে স্বভাবসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'সদেক্বীন' তথা সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাহচর্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং সিদ্ধপুরুষদের 'জয্‌বা' অর্থাৎ আকর্ষণী-শক্তির কল্যাণে তাকওয়া মানব হৃদয়ে অপর রূপটিতে বিকশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই হচ্ছে পুণ্যবান লোকের সাহচর্যের কল্যাণ ও বরকত এবং সিদ্ধপুরুষদের 'জয্‌বা'র প্রভাব ও সুফল**। এই 'জয্‌বা' বলতে কী বুঝায়? বস্তুতঃ সিদ্ধপুরুষগণ (–কামেলীন) যখন ওরূপ ব্যক্তিকে তাকওয়া অবলম্বনে সচেষ্ট ও সংগ্রামরত অবস্থায় দেখেন তখন তাঁদের অন্তরে তার জন্য এক অসাধারণ মহব্বতপূর্ণ আবেগানুভূতির সৃষ্টি হয় এবং তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করে থাকেন। এহেন জয্‌বাই হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সাহাবাদের মাঝে ক্রিয়াশীল হতে আমরা দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে হাদীসাবলীতে অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান যে, রসূল করীম (সঃ) কারও প্রাথমিক অবস্থা দৃষ্টে তার প্রতি দয়াপরবশ হতেন এবং তার জন্য শুভ আকাঙ্ক্ষা ও দোয়া করতেন যাতে সে নিম্নতন অবস্থা থেকে অবস্থা উঠে যায়। এরই ফলশ্রুতিতে তাকওয়া চেষ্টারত সে ব্যক্তির স্বভাবের সাথে মিশে গিয়ে উহার অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ওরূপ না হয়, সংগ্রামরত ব্যক্তির পক্ষে কখনও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। এরপর কী হবে? বলছেন,

"অতঃপর যাতে 'মিশ্‌কাতী নূর' হৃদয়ে সৃষ্টি হয়ে যায়।" এই মিশ্‌কাত বলতে কুরআনে উল্লেখিত 'তাঁর নূরের উপমা তাক সদৃশ' বিষয়টি-ই বুঝায়। সেই 'মিশ্‌কাতের' দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্মর্তব্য যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, তিনি সেই মিশকাত বা তাক সদৃশ, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর সমুজ্জ্বল রয়েছে। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "যা 'ওবুদীয়ত' ও 'রবুবীয়ত'-এর পরস্পর অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কের দরুন সৃষ্টি হয়।" লক্ষ্য করুন যে, ভাষা কঠিন হলেও কিন্তু বিষয়-বস্তু কতো বাস্তব, অকাট্য ও সুস্পষ্ট। মৌলিকভাবে বিষয়-বস্তু সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিশদভাবে বোঝাবার উদ্দেশ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে পরিভাষাগত এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে হয়। বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, 'এই মিশ্‌কাতী নূর 'রব্ব' (প্রতিপালক প্রভু)-এর সহিত 'আব্দ' (ইবাদত ও আনুগত্যকারী বান্দা)-এর সম্পর্ক যদি অত্যন্ত গভীর হয়– যেমন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) 'আব্দে-কামেল' এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন 'আররব্ব,' এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র নূর বান্দার হৃদয়ে স্থানান্তরিত না হয়ে পারে না। অতএব, নূর হাসিল হবার পন্থাসমূহ দেখিয়ে দিলেন। নইলে, এগুলো সুদূর পরাহত বিষয়-স্বরূপ হয়ে পড়ে থাকতো। এখন লক্ষ্য করুন, এসব বর্ণনার দ্বারা মানুষ বাস্তব সত্যসমূহের কতো ঘনিষ্ঠ হতে পারে। অতঃপর তিনি বলছেন, "ইহাকে সূফীগণ 'রূহে-কুদ্‌স'-ও বলে থাকেন।" বস্তুতঃ হৃদয়ে নূর উদ্ভাসিত হওয়া এবং আব্দ ও রব্বের মাঝে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার অবস্থাটিকে সূফীগণের পরিভাষায় 'রূহে-কুদ্‌স' বলে অভিহিত। উল্লেখ্য যে, এখানে 'আর-রুহুল-কুদুস'-এর কথা বলা হয় নি, যা এক ফিরিশ্‌তার নাম। বরং বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, ওরূপ অবস্থায় স্বয়ং সে-ব্যক্তির হৃদয় বা আত্মা প্রকৃত অর্থে সুহৃদ ও সদাত্মায় পরিণত হয়।'এই রূহে-কুদ্‌স' সৃষ্টি হবার (অর্থাৎ সে-ব্যক্তির আত্মা সৎ ও পবিত্র হওয়ার) পর খোদাতাআলার অবাধ্যতা তার কাছে সেইরূপ স্বভাবতঃ ঘৃণ্য মনে হয় যেরূপ স্বয়ং খোদাতাআলার দৃষ্টিতে উহা ঘৃণ্য। "কাজেই 'রূহে-কুদ্‌স'-এর সংজ্ঞা বা পরিচিতি হচ্ছে এই যে, ওরূপ ব্যক্তির মন-মানসিকতা আল্লাহ্‌র সাথে এতো মিলে যায় যে, আল্লাহ্ যে-সব বস্তুকে ঘৃণা করেন, সে-গুলোকে এহেন ব্যক্তিও ঘৃণা করে থাকে। এবং এর ফলে সব রকম অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা তার কাছে অতি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। "অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত পাপাচার কারও কাছে স্বভাবতঃ ঘৃণ্য বলে পরিলক্ষিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পাপাচার থেকে বাঁচার চেষ্টা অত্যন্ত কঠিন হয়ে থাকে।" নচেৎ, উহা নিশ্চয় নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। কাজেই তিনি বলেছেন, "এই 'রূহে-কামেল' অর্জন করার চেষ্টা কর।" যা প্রতিপালক প্রভু-'রব্বে'র সাথে আব্দের সত্যিকারার্থে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দরুনই সৃষ্টি হয়। ওরূপ যদি হয় তাহলে বাকীটুকু হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র কাজ। এই অর্থে যে, তোমাকে আর কোনও চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে সেই মাকামে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হবে না, যা ভালবাসার ফলশ্রুতিতে আপনা-আপনিই হাসিল হবে। **এক নূর আসমান থেকে তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হবে এবং তোমার ফিৎরত বা স্বভাবকে পাক-পবিত্র করে দিবে। ফিৎরত পবিত্র হবার অর্থই হচ্ছে যে, আল্লাহ্ যেমন পবিত্র, তেমনি তুমিও পবিত্র (বলে সাব্যস্ত হবে)**। উভয় যেন একরকম হয়ে যায় বাসনা ও ঘৃণা ইত্যাদিতে। এই মর্তবা যখন হাসিল হয়, তখন প্রকৃত খালেক ও মালেক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব তার কাছে গৌণ ও অগুরুত্বপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ সাংসারিক জীবনে কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তার দৃষ্টিতে কোন কিছুই আর তেমন গুরুত্ব বহন করে না। এই শ্রেণীর লোক দুনিয়াতে চলা-ফেরা করেন, ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে সব কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সবকিছুর সৌন্দর্যও তারা অবলোকন করে থাকেন, কিন্তু সেই সৌন্দর্য তাদেরকে নিজের দিকে সরাসরি আকৃষ্ট করতে পারে না এই অর্থে যে, খোদা থেকে সরে গিয়ে যেন তা তাদের লাভ হয়। তেমনটি কখনও হয় না। বিষয়-বস্তু এখনও অব্যাহত রয়েছে। সময় যেহেতু হাতে আর নেই, আগামীতে ইন্‌শাল্লাহ্ এ বিষয়টি থেকেই আরম্ভ করা হবে।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনূদিত)

অনুবাদ : **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরব্বী

প্রত্যেক মানুষের নিজের আমলসমূহের তদারকী এমনভাবে করা উচিত এবং সাথে সাথে দোয়াও করা উচিত যাতে এগুলো অপরের পদস্খলনের কারণ না হয়! হযরত ঈসা (আঃ) উক্ত বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে-ব্যক্তি কারও জন্যে হোঁচটের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার মা যদি তাকে জন্ম না দিত তবেই ভাল হতো। কেননা, সে ব্যক্তিও আল্লাহতালা কর্তৃক ধৃত হবে।

[খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ২৮-৬-৯২ ইং খুতবা]

হাকীকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(২৩তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐ সকল ইলহামের বর্ণনায় যাহা একাউন্টেন্ট বাবু এলাহী বখ্শ সাহেব সম্পর্কে খোদাতাআলা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন

বাবু এলাহী বখ্শ সাহেব যখন "আসায়ে মূসা" পুস্তক প্রণয়ন করেন তখন এই প্রণয়নের কারণ ইহাই ছিল যে, তিনি আমাকে ফেরাউন ঘোষণা করেন এবং নিজেকে মূসা সাব্যস্ত করেন। তিনি বার বার লেখেন, আমার নিকট খোদার ইলহাম হয় যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল ও আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বানোয়াটকারী। তখন আমি তাহার পুস্তক পড়িয়া আমার পুস্তকে 'আরবাঈন' নম্বর ৪-এর টীকায় নিম্নবর্ণিত এবারত লিখি। ইহাতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও দোয়া আছে। তাহা এই যে :

আফসোস, তিনি (অর্থাৎ বাবু এলাহী বখ্শ সাহেব) 'ওয়াইলুল্লে কুল্লে হুমাযাতিল্ লুমাযাহ্' (সূরা আল্ হুমাযাহ্–আয়াত ২ – অর্থ : দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদকারীর জন্য–অনুবাদক) আয়াতের 'ওয়াইল' (অর্থ : দুর্ভোগ–অনুবাদক)-এর শাস্তির ব্যাপারে কিছুই আশংকা করিলেন না এবং না তিনি 'লা তাকফু মা লায়সা লাকা বেহি এলমুন' (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত-৩৭ – অর্থ: যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার পশ্চাদানুসরণ করিও না–অনুবাদক) আয়াতেরও কিছুই পরোয়া করিলেন না। তিনি বারবার আমার সম্পর্কে লেখেন, আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়াছি যে, আমি আপনার মিথ্যা বানোয়াটের দরুন কোন মানুষের আদালতে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিব না। অতএব আমি বলিতেছি যে, আমি কেবল মানুষের আদালতেই নালিশ করিব না বরং আমি খোদার আদালতে নালিশ করি না। কিন্তু যেহেতু আপনি আমার উপর কেবল মিথ্যা ও লজ্জাকর অপবাদ লাগাইয়াছেন এবং যে পাপ করি নাই উহার জন্য কষ্ট দিয়াছেন, সেজন্য আমি কখনো বিশ্বাস করি না আমি ঐ সময়ের পূর্বে মরিব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সর্বশক্তিমান খোদা এই সকল মিথ্যা অপবাদ হইতে আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া আপনার মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণ না করেন। 'আলা ইন্না লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' (অর্থ :. শুন, নিশ্চয় মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত–অনুবাদক)। ইহার সম্পর্কেই সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে আমার নিকট ১৯০০ সালের ১১ই ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার এই ইলহাম হয় :

হার মাকাম ফালাক শুদাহ্ ইয়্যা রব্ব ইনশাল্লাহ্
গর উমিদে দিহম মাদারে আজব–বা'দ গেয়ারাহ্

[অর্থ : খোদাতাআলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তোমার দোহাই এখন আকাশে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আমি যদি এখন তোমাকে কোন প্রত্যাশা প্রদান করি তাহা হইলে তুমি আশ্চর্যান্বিত হইও না। ইহা আমার সুন্নত ও দানের বহির্ভূত নহে। "১১ (এগার) এর পরে" ইহার মর্ম বুঝা গেল না (তাযকেরা ৪০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)]।

কিন্তু যাহা হউক আমাকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য একটি নিদর্শন এই সময়ে প্রকাশিত হইবে, যাহা আপনাকে ভীষণ লজ্জিত করিবে। খোদার কালাম (কথা) সম্পর্কে হাসি-তামাশা করিও না। পাহাড় টলিয়া যায়। নদী শুকাইয়া যাইতে পারে। মৌসুম পরিবর্তিত হইয়া যায়। খোদার কালামের পরিবর্তন হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা পূর্ণ না হয়।

অনুরূপভাবে আমার পুস্তক 'আরবাঈন' নম্বর ৪-এর ১৯ পৃষ্ঠায় বাবু এলাহী বখ্শ সাহেব সম্পর্কে এই ইলহাম আছে–ইউরীদূনা আইঁয়ারাও তামাসাকা ওয়াল্লাহো ইউরীদা আইঁইউরীকা ইনয়ামাহু। আল্ ইন্‌য়ামাতেল মুত্‌ওয়াতেরাতে। আনতা মিন্নি বেমাতফেলাতে আওলাদী; ওয়াল্লাহু ওলীয়্যুকা ওয়া রব্বাকা; ফাকুল্‌না য়ানারোকুনী বারদান্ অর্থাৎ বাবু এলাহী বখ্শ চাহে যে, সে তোমার হায়েজ (ঋতুস্রাব) দেখিবে বা তোমার কোন নোংরামী ও অপবিত্রতা সম্পর্কে অবহিত হইবে। কিন্তু খোদাতাআলা তোমাকে তাঁহার পুরস্কারসমূহ দেখাইবেন, যাহা ক্রমাগত হইবে। তোমার মধ্যে 'হায়েজ' নহে বরং ঐ সন্তান হইয়া গিয়াছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তানতুল্য। অর্থাৎ 'হায়েজ' একটি অপবিত্র বস্তু। কিন্তু সন্তানের শরীর এই 'হায়েজ' দ্বারাই তৈরী হয়। এইভাবে যখন মানুষ খোদার হইয়া যায় তখন প্রকৃতিগত যত অপবিত্রতা ও নোংরামী আছে, যাহা মানুষের প্রকৃতিতে লাগিয়া থাকে, তাহা হইতে একটি আধ্যাত্মিক দেহ তৈরী হয়। এই অপত্রিতাই মানুষের উন্নতির কারণ। ইহার ভিত্তিতেই সুফীগণ বলেন, যদি পাপ না থাকে তবে মানুষ কোন উন্নতি করিতে পারে না। আদমের উন্নতিরও ইহাই কারণ হইল। এই কারণেই প্রত্যেক নবী গোপন দুর্বলতাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'ইস্তেগফার' (পাপ ক্ষমা চাওয়া)-এ মগ্ন থাকিতেন এবং ঐ ভীতিই উন্নতির কারণ হইত। খোদা বলেন, 'ইন্নাল্লাহা ইউহেব্বুত্ তাওওয়াবীনা ওয়া ইউহেব্বুল মুতাতাহ্‌হেরীন' (সূরা আল্ বাকারা : আয়াত–২২৩ – অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীগণকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীগণকেও ভালবাসেন–অনুবাদক)। অতএব প্রত্যেক আদম-সন্তান নিজের মধ্যে একটি 'হায়েজ'-এর অপবিত্রতা ধারণ করে। কিন্তু যে খাঁটি অন্তঃকরণে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, ঐ হায়েজই তাহার একটি পবিত্র ছেলের দেহ তৈয়ার করিয়া দেয়। ইহার ভিত্তিতেই খোদায় আত্মবিলীনকারীদিগকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলা হয়। কিন্তু ইহা নহে যে, সে প্রকৃতপক্ষেই খোদার পুত্র। কেননা, ইহাতো কুফরী কথা। খোদা পুত্র হইতে পবিত্র। বরং এইজন্য রূপকভাবে তাহাদিগকে খোদার পুত্র বলা হয় যে, তাহারা শিশুর ন্যায় হৃদয়াবেগের সহিত খোদাকে স্মরণ করিতে থাকে। এই মাহাত্ম্যের প্রতি কুরআন শরীফে ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে 'ফাযকুরুল্লাহা কাযিক্‌রিকুম আবায়াকুম আও আশাদ্দা যিক্‌রান' (সূরা আল্ বাকারা : আয়াত– ২০১) অর্থাৎ খোদাকে এইরূপ ভালবাসা ও হৃদয়াবেগের সহিত স্মরণ কর যেভাবে শিশু তাহার পিতাকে স্মরণ করে। ইহার ভিত্তিতে প্রত্যেক জাতির ধর্মগ্রন্থে খোদাকে 'আব' বা 'পিতা'-এর নামে ডাকা হইয়াছে। তাহা এই যে, যেভাবে মা নিজ গর্ভে স্বীয় সন্তানের প্রতিপালন করে, তদ্রূপেই খোদাতাআলার প্রিয় বান্দাগণ খোদার ভালবাসার কোলে প্রতিপালিত হন এবং তাহারা এক অপবিত্র প্রকৃতি হইতে এক পবিত্র দেহ লাভ

করেন। অতএব সুফীগণ আওলীয়াকে যে খোদার সন্তান বলেন তাহা কেবল একটি রূপক। নতুবা খোদা সন্তান হইতে পবিত্র এবং 'লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ' (সূরা আল্ ইখ্লাস : আয়াত-৪ – অর্থ : তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই–অনুবাদক)

উল্লিখিত ইলহামের 'ফাকুলনা ইয়া নারো কুনী বারদান' অংশের অর্থ এই যে, বাবু এলাহী বখ্শ তাহার পুস্তক দ্বারা লোকদের মধ্যে যে ফেতনার আগুন জ্বালাইয়া দিল, আমরা ঐ আগুনকে ঠাণ্ডা করিয়া দিব। অতএব বাবু এলাহী বখ্শের মৃত্যু এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করিয়া দিল– 'আল্হামদুলিল্লাহ্ আলা যালেকা' (অর্থ : ইহার উপর আল্লাহ্র প্রশংসা–অনুবাদক)।

বাবু এলাহী বখ্শ সাহেবের মৃত্যু সম্পর্কে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী উহা, যাহা ১৯০৭ সালের ১৫ই মার্চে খোদাতাআলার তরফ হইতে হইয়া বদর ও আল্ হাকাম-এ প্রকাশিত হয়। তাহা এই যে :

"এক মূসা আছে। আমি তাহাকে প্রকাশ করিব এবং লোকদের নিকট তাহাকে সম্মান দিব। কিন্তু যে আমাকে অস্বীকার করিয়াছে আমি তাহাকে পিষিব এবং তাহাকে দোযখ দেখাইব। আমার নিদর্শন উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। আমার দুশমন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এখন তাহার লেখা খোদার হাতে চলিয়া গিয়াছে।"

খোদা এই জায়গায় আমার নাম মূসা রাখিয়াছেন, যেভাবে আজ হইতে ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ার কয়েক স্থানে আমার নাম মূসা রাখা হইয়াছে। ইল্হামের সার সংক্ষেপ এই যে, এই যুগে মূসা একজনই আছে, দুইজন নাই। যে দ্বিতীয় মূসা হওয়ার দাবী করিতেছে সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর বলা হইয়াছে, যে আমার তরফ হইতে মূসা, সময় আসিয়া গিয়াছে আমি তাহাকে প্রকাশ করিব এবং লোকদের নিকট তাহাকে সম্মান দিব। কিন্তু যে আমাকে অস্বীকার করিয়াছে, অর্থাৎ মিথ্যার ভিত্তিতে মূসা সাজিয়াছে আমি তাহাকে পিষিব, অর্থাৎ লাঞ্ছনা দেখাইব ও লাঞ্ছনার মৃত্যু দিব। তাহাকে দোযখ দেখাইব অর্থাৎ সে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মরিবে। পূর্ণ ব্যাখ্যার সহিত এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল খোদাতাআলার পক্ষ হইতে। কেননা, ঐ যুগে আমার মোকাবেলায় মূসা হওয়ার দাবীকারক কেবল বাবু এলাহী বখ্শ ছিল, যাহাকে খোদাতাআলা প্লেগে ধ্বংস করেন। তাহার ব্যাধি ও মৃত্যুর পূর্বে সাধারণভাবে বদর ও আল্ হাকাম পত্রিকার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে খোদার এই ইলহাম প্রকাশ করা হইয়াছে। অবশেষে ঘটনা এইরূপ ঘটিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমার সকল ইলহামে জাহান্নাম দ্বারা প্লেগকে বুঝায়। অতএব, ইহা আযীমুশ্শান ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যাহাতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বলা হইয়াছিল যে, বাবু এলাহী বখ্শ সাহেব প্লেগে মারা যাইবেন। নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি যে, আমার ইলহামসমূহে জাহান্নামের অর্থ প্লেগ। উদাহরণস্বরূপ, এক দীর্ঘ সময় পূর্বে আমার নিকট একটি ইলহাম হয় এবং ব্যাখ্যাসহ উহা বদর ও আল্ হাকামে প্রকাশ করা হয়। তাহা এই যে :

'ইয়াতি আলা জাহান্নাম যামানা লায়সা ফিহা আসাদ।' ইহার ব্যাখ্যা এই করা হইয়াছে, প্লেগের এক যুগ এইরূপ আসিবে যে, এই দেশে একজনও থাকিবে না, যে ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। অর্থাৎ সাধারণভাবে খোদা লোকদিগকে এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া দিবেন। উহা ছাড়া আরো একটি ইলহাম আছে, যাহাতে আগুনের অর্থ প্লেগ। ইহাও এক দীর্ঘ সময় পূর্বে প্রকাশ করা হয়। তাহা হইল : আমাকে আগুনের ভয় দেখাইও না। আগুন আমার দাস, বরং আমার দাসদের দাস। অর্থাৎ আমার কথা কি আর বলিব, যে সকল লোক আমার জন্য খাঁটি ও পূর্ণ ভালবাসা পোষণ করে তাহারাও প্লেগ হইতে রক্ষা পাইবে।

অবশেষে একজন ন্যায়-নিষ্ঠ মানুষের জন্য বাবু এলাহী বখ্শ সাহেবের ব্যাপারে দুইটি বিষয় খুব মনোযোগের দাবী রাখে।

প্রথমতঃ এই বিষয়টি চিন্তার যোগ্য যে, যখন বাবু এলাহী বখ্শ সাহেব আমার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণে ও মিথ্যারোপ করিয়া আমার অস্বীকৃতিতে তাহার বন্ধুদিগকে নিজের ইলহাম শুনাইতে লাগিল তখন ঐ সময় আমার পক্ষ হইতে এই বিষয়ের ফয়সালার জন্য কি আবেদন করা হইয়াছিল? সুতরাং ঐ আবেদন বাবু সাহেবের পুস্তক 'আসায়ে মূসা' এর ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে, যাহা পড়িয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ আবেদন প্রকৃতপক্ষে মোবাহালার আকারে ছিল। অথবা এইরূপ বল, উহা ছিল সরল অন্তঃকরণে আলাহ্তাআলার ফয়সালার জন্য একটি দোয়া। ইহার ঐ এবারত, যাহা অর্থের সহিত সম্পর্কিত, তাহা নিম্নে লেখা হইল। তাহা এই যে :

"যেহেতু আসমানী ফয়সালা আমার কাম্য, অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য এই যে, লোকেরা যেন এইরূপ ব্যক্তিকে সনাক্ত করিয়া সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। যাহার সত্তা প্রকৃতপক্ষে লোকদের জন্য উপকারী এবং লোকেরা যেন এইরূপ ব্যক্তিকে সনাক্ত করিয়া নেয়, যে প্রকৃতপক্ষে খোদাতাআলার পক্ষ হইতে ইমাম। এখন পর্যন্ত ইহা কে জানে যে, তিনি কে? কেবল খোদা জানেন, অথবা তাহারা জানে যাহাদিগকে খোদাতাআলার তরফ হইতে অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে (অর্থাৎ বাবু সাহেব তাহার ঐ সকল ইলহাম, যাহা মিথ্যারোপের মাধ্যমে আমাকে অস্বীকার করা সম্পর্কিত, সেইগুলি প্রকাশ করিয়া দিবেন)। অতএব যদি মুন্সী সাহেবের ইলহামসমূহ প্রকৃতপক্ষে খোদাতাআলার তরফ হইতে হইয়া থাকে তবে ঐ ইলহাম যাহা আমার সম্পর্কে তাহার নিকট হইয়াছে, উহা নিজ সততার কোন অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করিবে (অর্থাৎ নিশ্চয় ইহার পরে আমার উপর কোন বিনাশ ও ধ্বংস আসিবে)। এইভাবে এই দয়ারযোগ্য সৃষ্টি সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদী হইতে মুক্তি পাইয়া যাইবে (অর্থাৎ সে স্থলে বাবু সাহেব আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন, আমি যেন মসীহ মাওউদের দাবী করিয়া খোদার নামে মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিয়াছি, সে স্থলে আমি ধ্বংস হইয়া যাইব)। যদি খোদাতাআলার জ্ঞানে এইরূপ কোন ব্যাপার থাকে যাহা এই কুধারণার পরিপন্থী তবে উহা দেদীপ্যমান হইয়া যাইবে (অর্থাৎ যদি খোদাতাআলার জ্ঞানে প্রকৃতপক্ষে আমি মসীহ মাওউদ হই তবে খোদাতাআলা আমার জন্য সাক্ষ্য দিবেন)। আমি ওয়াদা করিতেছি যে, নাউযুবিল্লাহ্ আমার তরফ হইতে আপনার বিরুদ্ধে না কোন নালিশ করা হইবে, না আপনার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অযথা আক্রমণ করা হইবে। আমি কেবল খোদাতাআলার নিকট হইতে সমস্যার নিরসন চাহিব (অর্থাৎ ইহা চাহিব যে, যদি আমি মিথ্যা বানোয়াটকারী না হই এবং আমার উপর যে আক্রমণ করা হয় তাহা মিথ্যা ও যালেমানা তবে আমার নির্দোষিতা ও বাবু সাহেবের মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য খোদা নিজেই কোন ব্যাপার অবতীর্ণ করিবেন। কেননা, নির্দোষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা নবীগণের সুন্নত, যেমন হযরত ইউসুফ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।" এবং

সত্যবাদীগণকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া দেওয়া খোদার আদি সুন্নত। * ইহা আমার ঐ চিঠি যাহা বাবু সাহেবের পুস্তক "আসায়ে মূসা"-এর ৫, ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। বলা বাহুল্য এই চিঠিতেও আমি খোদাতাআলার নিকট ফয়সালা চাহিয়াছিলাম। ইহার পরে খোদাতাআলা যে ফয়সালা করেন তাহাতে প্রতীয়মান হয়, এক দিকে খোদাতাআলা সবদিক হইতে আমাকে উন্নতি দান করেন এবং অন্যদিকে বাবু এলাহী বখ্‌শ সাহেবকে চরম ব্যর্থতার অবস্থায় পৃথিবী হইতে উঠাইয়া নিলেন। তিনি শত শত আক্ষেপের সহিত প্লেগের ব্যাধিতে পৃথিবী ত্যাগ করেন। তাহার হৃদয় কি চাহিয়াছিল যে, তিনি প্লেগে মরিয়া যান এবং তাহাও আবার আমার জীবদ্দশাতেই? কিন্তু খোদা এইরূপই করিলেন।

ন্যায়-নিষ্ঠ লোকদের জন্য দ্বিতীয় চিন্তার যোগ্য বিষয় এই যে, বাবু এলাহী বখ্‌শ সাহেব আমার মোকাবেলায় তাহার নিকট এক বৎসরের ইলহামের যে ভাণ্ডার ছিল উহার সবটাই তাহার পুস্তক "আসায়ে মূসা"তে প্রকাশ করিয়া দিলেন, যাহার সার-সংক্ষেপ ইহাই ছিল যেন আমি ব্যর্থ ও বিফল হইয়া পরিণামে বাবু সাহেবের জীবদ্দশাতেই প্লেগে ধ্বংস হইয়া যাই এবং আমার জন্য বড় বড় ধ্বংসলীলা আসে ও আমার উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয় এবং মোবাহালার কুপ্রভাব আমাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। ইহার বিপরীতে বাবু সাহেবের বড় বড় উন্নতি হয়, খোদাতাআলা তাহাকে এক দীর্ঘ আয়ু দান করিবেন, তিনি আমার সব ধ্বংসলীলা নিজের চোখেই দেখেন, তাহাকে সম্পত্তি ও বাগান দেওয়া হইবে এবং বিপুল সংখ্যক লোক তাহার অনুগত হয়।

* আজ হইতে ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসর পূর্বে আমার পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ইলহামটি প্রকাশ করা হয়। আমার সম্পর্কে খোদাতাআলা ইঙ্গিত করিয়া বলেন, যেভাবে প্রথম মূসার উপর মিথ্যা অপবাদ লাগানো হইয়াছিল, সেভাবে এই মূসার উপর অর্থাৎ এই অধমের উপরও মিথ্যা অপবাদ লাগানো হইবে। কিন্তু খোদা তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করিবেন। ইলহামের এবারত ইহা : 'ফারব্বায়াহুল্লাহু মিম্মা কালু ওয়াকানা এন্দাল্লাহে ওয়াজিহান' (সূরা আহ্‌যাব : আয়াত-৭) (অর্থ : কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে উহা হইতে নির্দোষ প্রমাণ করিলেন যাহা তাহারা রটনা করিয়াছিল। বস্তুতঃ (সে আল্লাহ্‌র দরবারে বড়ই সম্মানিত ছিল-অনুবাদক) বাবু সাহেবের মৃত্যুতে এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই।

এই সকল ইলহাম প্রায় এক বৎসরকালের, যাহা বাবু সাহেব আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহার পর বাবু সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ছয় বৎসর পর্যন্ত যে সকল ইলহাম ছিল ঐগুলি কোন কারণে গোপন রাখা হইয়াছে। নতুবা বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তির এক বৎসরের ইলহামসমূহ এতখানি, ছয় বৎসরে তাহা কতই না ব্যাপক হইবে। কিন্তু এখন এই সকল ইলহাম প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারে কোন আশাই নাই। কেননা, আমি সর্বদা শুনিয়া আসিতেছি যে, ঐগুলি আমার ব্যর্থতা ও আমার আযাবযোগ্য হওয়ার সহিত সম্পর্কিত ছিল। এখন সেক্ষেত্রে খোদাতাআলা ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে তাহার বন্ধুরা এইরূপ ইলহাম কেন প্রকাশ করিবেন? নিশ্চিতভাবে তাহারা তৎক্ষণাৎ বিলম্ব না করিয়া ঐগুলি আগুনে ফেলিয়া জ্বালাইয়া দিয়া থাকিবেন। যদি ঐগুলি জ্বালানো না হইয়া থাকে তবে তাহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মুন্সী আব্দুল হক সাহেব কসম খাইয়া বলুন, "আসায়ে মূসা" পুস্তক প্রণয়নের পরে ইলহামের ধারা কি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল? এমনকি ছয় বৎসর পর্যন্ত একটি ইলহামও হইল না? হায়! যদি ঐ অবশিষ্ট ইলহামসমূহ প্রকাশ করা হইত তবে আরো সত্যতা উদঘাটিত হইত। কেবল প্রবৃত্তির খেয়ালে যে সকল লোকের আমার উপর জেদ আছে তাহারা কখনো ঐ পথ অবলম্বন করিবে না, যদ্বারা সত্য প্রকাশিত হইয়া যায়। কিন্তু সত্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত খোদা ছাড়িবেন না। যদি আমি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা বানোয়াটকারী হই তবে আমারও এইরূপই পরিসমাপ্তি ঘটিবে, যেরূপ পরিসমাপ্তি বাবু এলাহী বখ্‌শের ঘটিয়াছে। কিন্তু যদি সম্মানিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত খোদা আমার সাথে থাকেন তবে এইরূপ অবস্থায় আমাকে ধ্বংস করিবেন না যে, আমার সম্মুখেও অভিসম্পাত এবং পশ্চাতেও। কেননা, সত্যবাদীদের সহিত আদি হইতেই তাঁহার এই বিধান যে, তিনি তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন না। যদিও লোকেরা সত্যবাদীর মধ্যবর্তীকালীন সময়ে তাহাদের না বুঝার দরুন তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তাহার সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করে, কিন্তু পরিশেষে খোদাতাআলা সত্যবাদীর নির্দোষ হওয়া প্রকাশ করিবেন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : নাজীর আহমদ ভূঁইয়া

IMPORTANT NOTICE

All Rights in the transmissions on Muslim Television Ahmadiyya International are reserved. No part of these transmissions, programmes and materials including those on MTA website 'alislam' and the 'ADMONISH' teletext service, may be reproduced by any means, electronic (i.e INTERNET of others) or mechanical including photocpying,recording or any Information Storage and Retrieval systems save with the written permission from the Board of Management MTA International : 16 Gressenhall Road London SW18 5QL Tel : +44 181 870 0922, Fax : +44 181 870 0684.

Any Unauthorized or restricted acts in relation to the said transmissions, programmes and materials may result in civil proceedings for damages and/or criminal prosecution.

Copyright © 1998 by Muslim Television Ahmadiyya International London.

IMPORTANT NOTICE

All Rights of All the publications and books of the Jamaat are reserved.No part of these publications, books and materials in particular the recent book of Hazrat Ameer-ul-Momeneen 'Revelation, Rationality, Knowledge and truth', may be reproduced by any means, electronic (i.e INTERNET or others) or mechanical including photocopying, recording or any Information Storage and Retrieval systems save with the written permission from the Centre at :

16 Gressenhall Road London SW18 5QL.

Tel : +44 181 870 0922, Fax : +44 181 870 0684.

Any unauthorized or restricted acts in relation to the said publications and materials may result in civil proceedings for damages and/or criminal prosecution.

copyright © 1998 by Islam International Publications Ltd.

খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মূল ঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী

(অষ্টম কিস্তি)

মওদুদী সাহেবের উপস্থাপিত ভাষায় 'রেখা চিহ্নিত এবারত' মওদুদী সাহেব কিংবা তাঁহার সমর্থকগণ আল-ইক্‌তেসাদ পুস্তিকার মধ্যে প্রদর্শন করিবার সাহস রাখেন কি? কখনই না, কখনই না।

প্রকাশ থাকে যে, মুহাম্মদী উম্মতের এজমা' শুধু এই কথার উপর রহিয়াছে যে, রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের পর কোন 'তশ্‌রিয়ী (শরীয়ত দাতা) নবী' আসিতে পারেন না। 'খাতামুন্নাবীয়ীন' আয়াতে এবং "লা নাবীয়া বা'দী" প্রভৃতি হাদীস হইতে শুধু 'শরীয়ত দাতা নবীর আগমন' বন্ধ হইবার বিষয়ে 'এজমায়ে উম্মত' পাওয়া যায়। আহ্‌মদীয়া জমাত এই 'এজমায়ে-উম্মত'কে যথার্থ বলিয়া মান্য করে এবং এ 'এজমায়' তাহারাও শরীক। **কোন প্রকার 'তা'বীল তফসীল' বা 'ব্যাখ্যা ও ব্যতিক্রম' দ্বারা শরীয়ত-দাতা নবীর আগমন জায়েয করাকে খত্‌মে নবুওয়তের বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া আহ্‌মদীগণ দৃঢ় প্রত্যয় রাখে।**

খাতামুন্নাবীয়ীন আয়াতের তফসীর

আল্লাহ্‌তাআলা সূরা আহ্‌যাবে বলেন ঃ-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

অর্থাৎ "মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারো পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল ও নবীগণের মোহর এবং আল্লাহ্‌তাআলা সব বিষয়েই উত্তমরূপে জানেন।"

মওদুদী সাহেব এই আয়াতের তফসীর করিতে গিয়া লিখিয়াছেনঃ-

"আয়াতটি সূরায়ে আহযাবের পঞ্চম রুকুতে নাযিল হয়েছে। এই রুকুতে আল্লাহ্‌তাআলা সেইসব কাফের এবং মুনাফেকের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, যারা হযরত যয়নাবের সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের বিবাহের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে দিয়েছিলো। তাদের প্রথম প্রশ্ন হলো : আপনি নিজের পুত্রবধুকে বিবাহ করেছেন। অথচ আপনার নিজের শরীয়তও একথা বলে যে, পুত্রের বিবাহিতা স্ত্রী পিতার জন্য হারাম।* এর জবাবে বলা হলো – "মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারোর পিতা নন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা হলো, সে কি মুহাম্মদের (সঃ) পুত্র ছিল? তোমরা সবাই জান যে, মুহাম্মদের (সঃ) কোন পুত্র নেই।"

['খতমে নবুয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ১-২ পৃঃ]

এই পর্যন্ত মওদুদী সাহেবের বিবৃতি সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু পরে তিনি লিখিতেছেন ঃ-

"তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো ঃ পালিত পুত্র নিজের গর্ভজাত পুত্র নয়, একথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ হইতে পারে, কিন্তু তাকে অবশ্যই বিবাহ করতে হবে এর প্রয়োজনটা কোথায়? এর জবাবে বলা হলো – "কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল।" অর্থাৎ যে হালাল বস্তু তোমাদের রসম রেওয়াজের বদৌলতে অথবা হারামে পরিণত হয়েছে, সে সম্পর্কে যাবতীয় বিদ্বেষ এবং পক্ষপাতিত্ব খতম করে তার হালাল হওয়াকে নিঃসন্দেহ এবং নিঃসংশয় করে তোলা রসুলের অবশ্য করণীয় কাজ।

"আবার অতিরিক্ত জোর দেবার জন্যে বলেন, -"শেষ নবী।" অর্থাৎ তাঁর যুগে আইন এবং সমাজ সংস্কারমূলক কোনো বিধি প্রবর্তিত হয়ে থাকলে, এই সমাধা করার জন্যে তাঁর কোনো রসুল তো নয়ই, কোন নবীও আসবেন না। কাজেই জাহেলী যুগের রসম রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন এখনই দেখা দিয়েছে। এবং তিনি নিজেই এ কাজটা সমাধা করে যাবেন।" *['খতমে নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ৩-৪ পৃঃ]*

আয়াত 'মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্মির রিজালিকুম ("মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তোমাদের মধ্যে কাহারো পিতা নহেন") সম্বন্ধে কাফের ও মুনাফেকদের এই যে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইত বলিয়া মওদুদী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ তাঁহার নিকট না থাকায় 'খতমে নবুয়াত' পুস্তিকার পাদটীকায় ইহাকে 'প্রসঙ্গতঃ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবৃত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মওদুদী সাহেব ছাড়া কোন মুফাস্‌সেরের মনোযোগ এদিকে যায় নাই যে, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্মির রিজালিকুম– হইতে এই প্রশ্নের উদ্ভব হয়। বরং এই প্রশ্ন এই আয়াত হইতে শুধু মওদুদী সাহেবের মানসেই সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী বাক্য– *ওয়া লাকির রসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবিঈন* এই প্রশ্নের জবাব হইতেই পারে না যে, তিনি 'আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামান্নাবীয়ীন' বলিয়া এই বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে জরুরী ছিল। কারণ, এই প্রশ্ন এবং উত্তরের পরেও প্রশ্ন বাকী থাকে যে, তিনি 'আল্লাহ্‌র রসূল ও খাতামান্নাবীয়ীন হওয়াতে এই বিবাহ করা জায়েয বলিয়া তাঁহারই কি এই বিবাহ করা জরুরী ছিল? ইহা তো কোনই উত্তর নয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল ও খাতামান্নাবীয়ীন বলিয়া এই বিবাহ তাঁহারই করা অত্যাবশ্যক ছিল। 'উম্মতের জন্য এইরূপ বিবাহ হালাল হওয়া' খোদাতাআলা তাঁহার কালামের বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিংবা রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম তাঁহার বাক্য দ্বারা ইহা বৈধ হওয়া নির্দেশ করিতে পারিতেন। সুতরাং, 'তাঁহারই কি এই বিবাহ করা জরুরী ছিল'? – এই প্রশ্নের মীমাংসা "রসূলুল্লাহ্" এবং "খাতামান্নাবীয়ীন" শব্দগুলিতে হয় না। "মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মধ্যে পুরুষদের কাহারো পিতা নহেন" বাক্য হইতে এই প্রশ্ন এ জন্যও উদ্ভব হয় না যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম এই বিবাহ কেন করিয়াছিলেন – ইহার উত্তর আল্লাহ্‌তাআলা 'খাতামান্নাবীয়ীন' সম্বলিত আয়াতের পূর্বে নিজেই এই প্রকারে দিয়াছিলেন :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

অর্থাৎ, "যায়েদ যখন যয়নাবকে তালাক দিল, তখন আমরা তাহার বিবাহ তোমার সঙ্গে করিয়া দিলাম, যাহাতে মু'মিনগণের হৃদয়ে তাহাদের পোষ্য পুত্রদের বধুদিগকে – যখন তাহারা উহাদিগকে

* বাংলা সংস্করণে এ কথাই আছে। মওদুদী সাহেব উর্দুতে "হকীকী বেটা" লিখিয়াছেন।

তালাক দেয় – বিবাহ করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ না থাকে।"

['সূরা আহযাব, রুকূ ৫]

সুতরাং, এই আয়াত বিদ্যমান থাকিতে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাহারো পিতা নহেন বলায় কোন কাফের এবং মুনাফেকের এই অধিকার ছিল না যে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিত যে ('এই বিবাহ') করা কি জরুরী ছিল? কারণ ইহার উত্তর তো আল্লাহ্তাআলা পূর্বেই দিয়াছেন। সুতরাং "ওয়ালাকির্ রসূলাল্লাহে" ('কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রসূল') এবং "খাতামান্নাবীয়ীন" শব্দগুলি এই প্রকার প্রশ্নের জবাব হইতে পারে না।

ইহা সত্ত্বেও যদি মওদুদী সাহেব একান্তই জেদ ধরেন যে, অন্ততঃ তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে তো "তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ করিয়া দিলাম, যাহাতে মু'মিনগণের হৃদয়ে কোন প্রকার সঙ্কোচ না থাকে" – বাক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও "মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মধ্যে পুরুষদের কাহারো পিতা নহেন" বাক্য হইতে এই প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, তিনি কেন এই বিবাহ করিয়াছিলেন, তবে আমরা নিবেদন করিব যে, মওদুদী সাহেব কিসের উপর ভিত্তি করিয়া "ওয়ালাকির্ রসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নাবীয়ীন" শব্দ সমষ্টির এই অনুবাদ করিয়াছেন যে, "তাঁর পর কোন রসুল তো নয়ই, কোন নবীও না"। "তো-নয়ই" অর্থ বোধক কোন শব্দ উল্লিখিত আয়াতে নাই। মওদুদী সাহেব 'খাতামান্নাবীয়ীন' সংক্রান্ত তাঁহার কাল্পনিক অর্থকে দাঁড় করাইবার জন্য অনুবাদে এগুলিকে ঢুকাইয়াছেন। ধরিয়া নেওয়া হউক, এখানে মওদুদী সাহেবের ধারণানুসারে এই প্রশ্নের উদ্ভব হইত যে, "এই কাজটা করবার এমন কি প্রয়োজন ছিল?" বিবাহ তো একটি শরীয়তের বিষয়, যাহা একজন শরীয়তদাতা নবীই তাঁহার কথা বা কাজ দ্বারা সমাধান করিতে পারিতেন। এ জন্য জবাবে "রসূলাল্লাহ্" এবং "খাতামান্নাবীয়ীন" শব্দগুলি যথাস্থানেই শরীয়তের দিক হইতে তাঁহার মর্যাদা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, "রসূলাল্লাহে" একজন শরীয়তদাতা রসূলের মর্যাদা প্রকাশ করিতেছে এবং "খাতামান্নাবীয়ীন" নবীগণের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীণ, শরীয়ত বাহক নবীর মর্যাদা প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ মওদুদী সাহেব স্বয়ং লিখিয়াছেনঃ-

"অর্থাৎ যে হালাল বস্তু তোমাদের রসম ও রেয়াজের বদৌলতে অযথা হারামে পরিণত হয়েছে, সে সম্পর্কে যাবতীয় বিদ্বেষ এবং পক্ষপাতিত্ব খতম করে তার হালাল হওয়াকে নিঃসন্দেহ এবং নিঃসংশয় করে তোলা রসূলের অবশ্য করণীয় কাজ।" *[খতমে নবুওয়াত, বাঙলা সংস্করণ, ৩ পৃঃ]*

মওদুদী সাহেবের কথা মত "রসূলাল্লাহ্" এর "খাতামান্নাবীয়ীন" শব্দগুলি সংযোজনার উপরোক্ত উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, এখানে "রসূল" দ্বারা 'শরীয়ত-দাতা রসূল' বুঝায় এবং "খাতামান্নাবীয়ীন" দ্বারা বুঝায় নবীগণের মধ্যে শরীয়তকে সর্বোতঃ সম্পূর্ণকারী নবী – যাঁহার পর কোন শরীয়তদাতা নবী আসিতে পারেন না এবং যদি আসেন, তবে তাঁহার খাতেমিয়তের বদৌলত তাঁহার কল্যাণের প্রভাবে তাঁহার শরীয়তের অনুসরণ দ্বারা একজন 'উম্মতী নবী' হওয়া বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে এবং উলামায় উম্মতেরও ইহাই মতবাদ রহিয়াছে। মসীহ মাওউদ তাঁহার পরে আসিবার ছিলেন এবং উম্মতি নবী হওয়ার ছিলেন। সুতরাং 'উম্মতী নবুওয়ত' 'খতমে নবুওয়তের' বিরোধী নয়। সুতরাং মওদুদী সাহেবের মস্তিষ্ক রচিত বক্তব্যও তাঁহার কোনই কাজে আসিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

আয়াতের প্রকৃত পরিবেশ

মওদুদী সাহেব বর্ণিত আয়াতের পরিবেশ ধরিয়া নিয়া আমরা উপরোক্ত মীমাংসা তাঁহার তর্কের ফলস্বরূপে লিখিলাম। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে আয়াতের প্রাসঙ্গিক মীমাংসা এই যে, যখন খোদাতাআলা বলিলেন ঃ

মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্মির রিজালিকুম

অর্থাৎ 'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে পুরুষদের কাহারো পিতা নহেন,' ইহাতে কাফেরদের মনে স্বভাবতঃ এই একটি মাত্র প্রশ্ন উদয় হইতে পারিত যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ পুরুষদের মধ্যে কাহারো পিতা নহেন বলিয়া তিনি ('নাউযুবিল্লাহ্) 'অপুত্রক' (আবতার) এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ নাই। এই সংশয় দূরীকরণার্থে আল্লাহ্তাআলা বলিলেন যে, এই বাক্য কোন পুরুষের পিতা না হওয়া সম্পর্কে বলা হয় নাই, পরন্তু দৈহিকভাবে তাঁহার পিতৃত্ব খণ্ডন করা হইয়াছে মাত্র। নচেৎ, "রসূলাল্লাহ্" এবং "খাতামান্নাবীয়ীন" হওয়ায় তিনি বুৎপত্তিগত অর্থে ও আধ্যাত্মিক হিসাবে নিশ্চয়ই পিতা। 'রসূলুল্লাহ্' বা 'আল্লাহ্র রসূল' হওয়া হিসাবে তিনি উম্মতের পিতা এবং 'খাতামান্নাবীয়ীন' হওয়ার দিক হইতে তিনি নবীগণেরও পিতা – শুধু শেষ নবী নহেন। আয়াতের পূর্বাপর বিবৃতির যে মীমাংসা আমরা পেশ করিলাম, দেওবন্দ 'দারুল-উলুম' প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলবী মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী সাহেবও সমর্থন করেন। তিনি লিখিয়াছেন।

جیسے خاتم بفتح تاء کا اثر اور نقش مختوم
علیہ میں ہوتا ہے ایسے ہی موصوف بالذات کا
اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے۔ حاصل مطلب
آیت کریمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ابوت
معروفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں پر ابوت معنوی
امتیوں کی نسبت بھی حاصل ہے اور انبیاء کی
نسبت بھی حاصل ہے۔ انبیاء کی نسبت تو فقط
آیت خاتم النبیین شاہد ہے کیونکہ اوصاف معروض
اور موصوف بالعرض (یعنی دوسری نبوتیں اور
دوسرے نبی) موصوف بالذات کی (آنحضرت صلی
علیہ وسلم) کی فرع ہوتے ہیں اور موصوف
بالذات اوصاف عرضیہ کی اصل ہوتا ہے اور
وہ اس کی نسل اور امتیوں کی نسبت لفظ
رسول اللہ میں غور کیجئے۔ [تحذیر الناس –
صفحہ ۱۰-۱۱]

অর্থাৎ, 'যেমন' তা' অক্ষরের উপর 'যবর' সহ 'খাতাম' (মোহর)-এর ক্রিয়া ছাপ মোহরাঙ্কিত বস্তুতে থাকে তেমনি মৌলিক গুণের অধিকারীর ক্রিয়া অমৌলিক গুণাধারে থাকে। এমতাবস্থায় আয়াতে

করীমার তাৎপর্য এই হইবে যে, কোন ব্যক্তির সম্পর্কেই সর্ব-সাধারণের জানা অর্থে পিতৃত্ব রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লামের ছিল না, **কিন্তু বুৎপত্তিগত অর্থে পিতৃত্ব উম্মতীগণের সম্পর্কেও ছিল এবং নবীগণের সম্পর্কেও তিনি প্রাপ্ত হন**। নবীগণ সম্পর্কে তো শুধু আয়াত "খাতামান্নাবীয়ীন" সাক্ষী। কারণ অমৌলিক গুণাবলী এবং অমৌলিক গুণধর (অর্থাৎ, অন্যান্য নবুওত ও অন্যান্য নবী) মৌলিক গুণধর (অর্থাৎ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের) শাখা এবং মৌলিক গুণধর অমৌলিক গুণাবলীর মূল – তাঁহারা ইহার বংশধর এবং উম্মতীগণ সম্বন্ধে "রসূলুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র রসূল) শব্দ নিয়া চিন্তা করুন *(তাহ্‌যিরুন্নাস, ১০-১১ পৃঃ)*।

"খাতামান্নাবীয়ীন"-এর এই অর্থগুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেন

"اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی (جو نبی آچکے) پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہو گی بلکہ افراد مقدرہ (جن کا انا تجویز کیا جائے) پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئیگا۔ [تحزیر الناس۔ صفحہ ۲۷]

"ইত্যাবস্থায় অতীত নবীগণের উপরই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইবে না, বরং ভবিষ্যতের জন্য নির্ধারিত- (ব্যক্তিগণের – অর্থাৎ, যাঁহাদের আগমন নির্ধারিত হইয়াছে, তাঁহাদের) উপরেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইবে। বরং যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগের পরেও কোন নবী জন্মগ্রহণ করিবেন, তথাপি মুহাম্মদী খাতামিয়তে কোনই প্রভেদ ঘটিবে না।" *['তাহযিরুন্-নাস', ২৮ পৃঃ]*। (চলবে)

অনুবাদ–**মরহুম এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার**

বিশেষ অনুরোধ

খাকসারের রেকর্ড সম্পূর্ণ করার জন্যে নিম্ন বর্ণিত পাক্ষিক আহমদীর সংখ্যাগুলো প্রয়োজন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি অনুগ্রহ করে সরবরাহ করলে বাধিত হবো।

মোহাম্মদ ফজলুল করিম মোল্লা
পাবলিশার পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায়ে বর্ষ	সংখ্যা
১৬	১৪,১৫,১৮, ২১
১৭	১০, ১৩, ১৬, ১৮, ১৯, ২০
১৮	১, ২, ৪, ৫, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২০, ২৪
১৯	১, ২, ৩, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮
২০	৮, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০
২১	২, ৪, ১৫, ১৬, ২১, ২৩, ২৪
২২	৮, ৯, ১২, ১৩, ১৬, ১৯
২৩	১৫, ২১
২৪	১৫, ২১, ২, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪
২৫	১ম থেকে ২৪ সংখ্যা পর্যন্ত
২৬	১ম থেকে ১০ সংখ্যা পর্যন্ত
২৭	১, ১৬, ১৭, ১৯, ২০
২৮	১, ২, ৩, ৮, ২১
২৯	৩, ৪, ৫
৩০	২
৩১	২১
৩২	২, ৬
৩৩	১৬, ১৮
৩৫	১১, ২২
৩৬	১২
৩৭	৪, ৫, ১১
৩৮	১ম থেকে ২৪ সংখ্যা পর্যন্ত
৩৯	৩
৪৫	৫, ৬
৫৮	১১, ১২

এল্যুমিনিয়মের পাত্র ব্যবহার ক্ষতিকারক!

এল্যুমিনিয়ম ধাতু নির্মিত পাত্র ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাইয়্যেদনা হুযূর আকদস (আইঃ) ৭-৬-১৯৯৭ তারিখে প্রচারিত উর্দু ক্লাস চলার সময়ে যখন ব্যাখ্যার সুযোগ আসলো তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদের উদ্ধৃতিতে আমি সারা বিশ্বের আহমদীদের এ বাণী দিতে চাই যে, খাবার পাক করা প্রভৃতির জন্যে যে, এল্যুমিনিয়মের পাত্র, বাসন-কোসন ইত্যাদি ব্যবহার করার হয় উহা মানব শরীরের জন্যে ক্ষতিকারক। এল্যুমিনিয়ম ধাতুটি ধীরে অথচ খুব গভীর প্রভাব বিস্তারকারী বিষ। ইহার কিছু না কিছু অংশ দ্রবীভূত হয়ে গিয়ে দেহের ওপরে প্রভাব সৃষ্টি করে। ইহা রক্ত প্রবাহী ধমনীতে খিচুনী ও সংকোচন সৃষ্টি করে। রক্তের ধমনীগুলোতে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে এবং মস্তিষ্কের পথে রক্তের প্রবাহকে ক্ষীণ করে দেয়। এর ফলে বৃদ্ধকালীন প্রভাবসমূহ সময়ের আগেই প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে।

গরীব দেশগুলোতে এ ধাতুর ব্যবহার খুবই সাধারণ। এর পরিবর্তে লোহা ও মাটির পাত্র **ব্যবহার করা উচিত**। একজন মহিলা ষ্টেইনলেস স্টিলের পাত্র সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গরীবদের জন্যে তো স্টেইনলেস স্টিলের পাত্রাদি ক্রয় করা কষ্টসাধ্য।

তিনি বলেন যে, উর্দু ক্লাসের জন্যে যারা খাবার তৈরী করে পাঠায় তারা যেন এল্যুমিনিয়মের পাত্র ব্যবহার করাকে **হারাম** মনে করে।

হুযূর (আইঃ) বলেন, যাদের ভিতরে এ ধাতুর কুপ্রভাবাদি প্রকাশিত হয় তাদেরকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ এলিউমিনা এক হাজার শক্তি কিছু দিন ব্যবহার করার পরে ১০ হাজার শক্তি ও পরে ৫০ হাজার শক্তি এবং পরে ছয় মাসের ব্যবধানে এক লক্ষ শক্তি ২বার খেতে ব্যবস্থা দিচ্ছি। এ রকম করে যদি ২ বছরের মধ্যে এর কোর্স পূরা করে দেয়া হয় তাহলে ইহা দেহ থেকে সব রকমের বিষ দূর করে দিয়ে শরীরকে যুবকের ন্যায় সুস্থ করে দেবে।

হুযূর (আইঃ) যা বলেছেন, তা লিখে দেয়া হলো।

মুহাম্মদ ইনাম গোরী, কাদিয়ান
(সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান, ১৮-৬-৯৮ তারিখের সৌজন্যে - সহকারী সম্পাদক)

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে
ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য
ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১২০৫৯৭, ৯১১৮৭৪৯

ইনকিলাবে হাকীকী
(প্রকৃত বিপ্লব)

মূল : হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(২১তম কিস্তি)

ইসলামী শিক্ষা উত্তম হওয়ার দলীল-প্রমাণ

এখন আমি ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি :

কেতাব বা ঐশী গ্রন্থের সাথে হেকমত বা প্রজ্ঞার বর্ণনা :

ইসলামে আদেশ-নিষেধ দলীল প্রমাণের সাথে বর্ণিত হয়েছে। যদ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তি খোদ আসল গ্রন্থে রচনা করা হয়েছে। ইহুদীদের ন্যায় অন্য কোন নবীর দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন সৃষ্টি হয় না। কুরআন মজীদের পূর্বে যে ঐশী গ্রন্থ ছিলো ওগুলোর মধ্যে আদেশ-নিষেধ তো জারী হতো। কিন্তু সাধারণত: উহাদের সমর্থনে দলীল-প্রমাণ দেয়া হতো না। উদাহরণস্বরূপ, ইহাতো বলা হতো যে, কেন নামায পড়বে? এতে কী কল্যাণ রয়েছে এবং উহার উদ্দেশ্যই বা কী? কিন্তু কুরআন করীম যেখানে উপদেশ দেয়, সেখানে তার আদেশ-নিষেধের দলীল-প্রমাণও দেয়া হয়। আর ইহার কল্যাণসমূহও বর্ণনা করা হয় এভাবে তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তি খোদ কুরআন করীমের মধ্যে এসে গেছে, আর এজন্যে আলাদা কোন নবীর প্রয়োজন থাকে না, যে-ভাবে ইহুদীরা হযরত মসীহ (আঃ)-এর প্রয়োজন অনুভব করেছিলো।

মধ্যবর্তী শিক্ষা :

দ্বিতীয়ত: কুরআন মধ্যবর্তী শিক্ষা নিয়ে আগমন করেছে যা সর্বাবস্থায় প্রযুক্ত। আর যেখানেই মানবীয় শক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় ঐ অবস্থায় উদ্ভূত সমস্যার সমাধানও এতে মজুদ আছে।

খোদাতাআলা এবং বান্দার সাক্ষাৎ সম্পর্ক :

এর মধ্যে পুরোহিত প্রথাকে মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ খোদাতাআলাও বান্দার মধ্যে ঐশী ইবাদতের ব্যাপারে পাদ্রী ও পণ্ডিতদের মধ্যস্থতার ধারণাকে কুরআন মজীদ একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছে। মূসায়ী ও ঈসায়ী বিশ্বাসের মধ্যে এর ওপরে খুবই জোর দেয়া হতো। কিন্তু এখন প্রত্যেক মু'মিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে নামায পড়াতে পারে। আর এর কোন প্রয়োজন নেই যে, কোন বিশিষ্ট মৌলবীকে ডেকে নেয় হোক। এ বিপ্লবও প্রকৃতপক্ষে একটি মহান বিপ্লব ছিলো। কেননা, পৃথিবী হাজার হাজার বছরে ধরে এ কয়েদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলো। কিন্তু কুরআন মজীদ উহাকে এক মুহূর্তে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। এবং বলে দিয়েছে যে, ইবাদতের মধ্যে কোন মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।

ইসলামের এই শিক্ষা খৃষ্টানদের জন্যে এতই বিস্ময়কর যে, তারা কয়েকবারই এ প্রশ্ন উথাপন করেছে যে, যদি আপনাদের মধ্যে পুরোহিত ও পাদ্রী না থাকে তাহলে আপনারা কীভাবে ইবাদত করে থাকেন।

ইবাদতের মোকাম ও মর্যাদার ব্যাপকতর করে দিয়েছে ঃ

চতুর্থতঃ ইসলাম ইবাদতের সীমারেখার গন্ডীকে উড়িয়ে দিয়েছে। আর ইবাদতের মোকাম বা স্থান কেবল ব্যবস্থাপনার জন্যেই থেকে গেল। ইবাদতের জন্যে মোকাম নির্ধারিত হয় নি। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুদের মন্দির, খৃষ্টানদের গীর্জাগুলো ইবাদতের জন্যে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আসলেন তখন তিনি বল্লেন, জু'ইলাত লীয়াল আরযু মাসজিদান অর্থাৎ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্যে মসজিদ করা হয়েছে। এর আগে যত নবী আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের শিক্ষার মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেয়া হতো যে, ইবাদত যেন বিশেষ বিশেষ স্থানে করা হয়। যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আসলেন তখন খোদাতাআলা তাঁর (সঃ) মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ (সেজদার স্থান-অনুবাদক) বানিয়ে দিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে পূর্বতন নবীদের ধর্ম যেহেতু সীমাবদ্ধ ছিলো তাই খোদাতাআলা ইবাদতের স্থানকেও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন খোদাতাআলা ভূপৃষ্ঠের সকল অংশকে পাক-পবিত্র করার জন্যে স্বীয় ধর্ম ইসলামকে প্রেরণ করলেন তখন সাথে সাথে এ আদেশও প্রদান করলেন যে, তোমরা সব স্থানে মসজিদ বানিয়ে পবিত্র করে নাও।

কথার মাধ্যমে ওহী অবতীর্ণ :

পঞ্চমত : আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে উহার সবটুকুই নির্ধারিত কথার আকারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এসব কথাকে না কেবল সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে বরং উহাদের সংরক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌তাআলা অঙ্গীকারও করেছেন এবং এ দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। এর ফলে বিতর্ক ও গবেষণার নীতিতে অনেক বড় পার্থক্য হয়ে গিয়েছে। প্রথমে এ প্রশ্ন উথাপিত হতো যে, ইহা মূসা (আঃ)-এর কথা বা খোদার কথা। কিন্তু মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হের ওয়া সাল্লামকে খোদাতাআলা যে শিক্ষা দান করেছিলেন এর প্রত্যেকটি কথা খোদাতাআলা স্বয়ং অবতীর্ণ করেছেন, বরং উহার যের এবং উহার যবর পর্যন্ত খোদাতাআলা অবতীর্ণ করেছেন।

আমি একবার স্বপ্নে দেখেছি যে, কোন এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করছে যে, কুরআন করীমে বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর কারণ কি? আমি তাকে এ জবাব দিলাম যে, কুরআন মজীদে কোন পুনরাবৃত্তি নেই। শব্দ তো আলাদা। কুরআন মজীদে তো যের ও যবরেরও পুনরাবৃত্তি নেই। যে 'যের' এক স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে উহার উদ্দেশ্য অন্য স্থানে ব্যবহৃত 'যের' থেকে আলাদা। আবার যে 'যবর' এক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে অন্য স্থানে ব্যবহৃত 'যবর' থেকে উহার অর্থ ভিন্ন। ইহা কুরআন মজীদের এমন বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোন ঐশী গ্রন্থের কখনও লাভ হয় নি। (চলবে)

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

জুমুআর খুতবা

পাকিস্তানে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিকাশের সঠিক ইতিহাস

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা তাং ১২ই জুন, ১৯৯৮ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) বলেন, সাম্প্রতিককালে ক'দিন আগে পাকিস্তান যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর তওফীক পেয়েছে, সে সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিপুল সংখ্যক পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন সংবাদ আসতে থাকে। বিজ্ঞানী-দের বিভিন্ন গ্রুপ কৃতিত্বের মুকুট নিজেদের মাথায় পরার চেষ্টা করে। এ নিয়ে বহির্বিশ্বে কিছুটা হাসাহাসিও হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানে পারমাণবিক প্রযুক্তির প্রাথমিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে (গুলিয়ে) দেওয়া হচ্ছে। বরং এর বিপরীতে আহ্‌মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী মৌলবাদীরা এই অপবাদ দিচ্ছে যে, যখন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলো তখন একটি বিস্ফোরণ রাবওয়ায়ও ঘটেছিল এবং সে'টি ছিল অত্যন্ত হতাশা, ক্ষোভ ও দুঃখ-বেদনার বিস্ফোরণ। এটা কী ঘটে গেলো? যে, পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে এতো অগ্রগতি হয়েছে সেজন্যে রাবওয়াবাসীদের মনে এতো আঘাত লেগেছে। বস্তুতঃ এহেন বকবকানী এই সব মৌলবীদের ধাতস্থ, তাদের স্বভাবে প্রবিষ্ট– তারা সবসময় সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে, পঙ্কিল কথা-বার্তা বলে থাকে, যে-সব কথার সঙ্গে সত্যের দূরতম সম্পর্কও নেই। এবং এই মৌলবীদের হঠকারী বাধা-বিপত্তির দরুন ইতিহাস যাদের স্মরণ থাকা উচিত তারাও আজ ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন– ইতিহাসকে তাদের মস্তিষ্ক থেকে মৌলবীদের গর্হিত হৈ চৈ হয়তো মুছে দিয়েছে, নয়তো তাদের স্মরণ তো আছে কিন্তু ভয়ের চোটে তারা চুপ মেরে থাকে (নীরব থাকে)। পাকিস্তানে পারমাণবিক ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করার আগে আমি এ বিষয়টি তুলে ধরতে চাই যে, **পাকিস্তানেই হোক অথবা দুনিয়ার অন্য কোথাও মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বার্থ জড়িত যে কোনও ব্যাপারে আহ্‌মদীয়া জামাতই বিনা ব্যতিক্রমে সদা অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর যেখানেই মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থ ব্যাহত (ও ক্ষতিগ্রস্থ) হয়েছে সেখানে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের পরামর্শ (ও দিকনির্দেশনা) উপেক্ষা করার দরুনই হয়েছে।**

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আহ্‌মদীয়া জামাতের ভূমিকা ও অবদানের ভূরি ভূরি রেফারেন্স দিয়ে এসেছি। এখন আমি মনে করি এই এক ঘন্টার সময়টিতে সেগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমার ঐ সকল খুতবা ও বক্তৃতা এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। সে-গুলোতে এ মর্মের বহুল সংখ্যক উদ্ধৃতি রয়েছে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আহ্‌মদীয়া জামাত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যদি তাদেরই ভূমিকা ইতিহাসের অধ্যায় থেকে বের করে দেয়া হয় তাহলে থেকে যায় ঐ মৌলবাদীরা যারা আজ পাকিস্তানে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বসেছে তাদের এই ইতিহাস যে, তারা তো পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করার যথাসাধ্য সব চেষ্টাই করেছিল। এখন ইতিহাসের এটা এতো জঘন্য দৃশ্যপট যে, **যারা পাকিস্তানকে মুছে ফেলার চেষ্টায় সবচেয়ে অগ্রভাগে ছিল তাদেরই মধ্যেকার এক ব্যক্তি যিনি আহ্‌রার নেতা আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারীর প্রথম সারির মুরীদ বলে অভিহিত তিনিই এখন দেশের রাষ্ট্রপতি বনে আছেন।** সুতরাং কোন জাতি যখন ইতিহাসকে মুছে ফেলতে মেতে ওঠে তখন অনুরূপ পরিণতিই হয়ে থাকে। সীমাছাড়া নেহায়েৎ ঘৃণ্য ব্যাপারগুলোই ঘটছে পাকিস্তানে, যেগুলো পাকিস্তানের চেয়ে আতাউল্লাহ্ শাহ্ ঘোষিত সেই 'পলিদস্তান' (নাপাকস্তান)-এর সঙ্গেই সম্পৃক্ত। তারই উক্তি ছিল যে, পাকিস্তান তো হতে পারবে না, তবে 'পলিদস্তান' তৈরী হবে। এখন সেই 'পলিদস্তান' বানাবার সবচেয়ে অধিক ভূমিকা পালন করছেন এ (দেশটির) বর্তমান রাষ্ট্রপতি। **সত্যিই তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত শাগরেদ, যিনি পাকিস্তানকে পলিদস্তানে পরিণত করার যে সংকল্প ছিল তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করেছেন।** তবে তিনি যে একা তা নয়, বরং সমগ্র জাতির মানসিকতাই বিকৃত হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের এতো ভ্রান্ত ভূমিকা যে, দুনিয়ার অন্যান্য সব চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও হতবাক হয়ে পড়েন। (কেননা,) 'ইসলামী' এই দেশটিতে সব ধরণের নির্লজ্জতা ঘটে চলেছে। প্রত্যেকটি নির্লজ্জতাই এই মৌলবীদের অনুমোদন পায় এবং প্রত্যেক নির্লজ্জতাকেই তারা পৃষ্ঠপোষণ করে থাকে। মিথ্যাচার তাদের ধাতস্থ (সেখানে) তাদের দৃষ্টিতে এই সব কিছুই 'ইসলাম'। কেবল আহ্‌মদীয়া জামাতের নাম নেওয়াটাই এক মহা অপরাধ। এই নামটি যদি উচ্চারণ করা না হয়, তাহলে সব কিছুই 'ইসলাম' এবং 'জায়েয'।

দেশ ও জাতি তথা মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বার্থ রক্ষায় ও সেবায় আহ্‌মদীয়া জামাতের ভূমিকা সংক্রান্ত উল্লিখিত বিষয়টির সম্পর্কে আমি পর্যাপ্ত তত্ত্ব-তথ্য ইতোপূর্বে সবিস্তারে বর্ণনা করে এসেছি। এখন শুধু ইশারা-ইঙ্গিতেই বলছি যে, পাকিস্তানের ইতিহাস হোক অথবা অন্য যে-কোন দেশের মুসলমানদের স্বার্থের বিষয় হোক সব ক্ষেত্রেই আহ্‌মদীয়া জামাত সদা সর্বপ্রথম মৌলিক ও প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে।

কাশ্মীর মুভমেন্ট ঃ- ১৯৩০-৩১ সালে আহ্‌মদীয়া জামাতের ২য় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) এই মহান আন্দোলনটির গোড়াপত্তন করেন এবং একাদিক্রমে ১৯৩৪ পর্যন্ত সেটিকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন উপায়ে প্রচারের মাধ্যমে প্রথমে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ ও জনমত সৃষ্টি করেন। তাদেরকে বোঝান, 'কাশ্মীরের সমস্যাদি এবং নির্যাতিত কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বার্থসমূহের দিকে আপনারা সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে আছেন। ওঠো এবং তাদের মুক্তির লক্ষ্যে কোন আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু কর।'

অতঃপর এই আন্দোলনের সূচনালগ্নে সুষ্ঠুভাবে এর পরিচালনার জন্যে আল্লামা ইকবালই সবার আগে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদের নাম পেশ করলেন, যা তৎকালীন সকল মুসলিম নেতৃবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করলেন। অতএব, ইহাও ইতিহাসের এরূপ একটি দিক, যা প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রামাণ্য রেফারেন্সের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় যে, কাশ্মীরের স্বাধীনতার সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও সফলভাবে পরিচালনাকারী জামাত হিসেবে আহ্মদীয়া জামাতই সাব্যস্ত হয়।

তেমনিভাবে, ফিলিস্তিন বিষয়ে সর্বপ্রথম এক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-ই ফিলিস্তিনীদেরকে সতর্ক করে আহ্বান করেছিলেন যে, তারা যেন নিজেদের জমি ইহুদীদের কাছে বিক্রি করা থেকে বিরত হয়। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'তোমরা যদি তোমাদের জমি বিক্রি কর তাহলে ওখানে তারা দাঁড়াবার স্থান পেয়ে যাবে। এখন তাদের কাছে তেমন কিছুই নেই। তোমাদের জমি কিনে নিয়ে সেখানে তারা তাদের দৃঢ় অবস্থান গড়ে তুলবে। তারপর তা বাড়াতে থাকবে এবং ক্রমশঃ তাদের প্রভাব বলয় তোমাদের আরব মুসলিম দেশগুলির উপর ছড়িয়ে পড়বে। অতএব, এটা মারাত্মক কাজ যা তোমরা করছো। এ থেকে বিরত হও।' তাঁর ঐ সময়োপযোগী পরামর্শ ও আন্তরিক আহ্বান সম্বলিত প্রবন্ধটি ইরাক ও ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য দেশের পত্র-পত্রিকায় অত্যন্ত সমাদৃত হয় এবং বহু সংখ্যক চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞ নেতৃবর্গ বলিষ্ঠভাবে এর সমর্থন করেন এই বলে যে, আরবদেরকে সঠিক পরামর্শ যদি কেউ দিয়ে থাকে তাহলে আহ্মদীয়া জামাতের ইমাম হযরত মাহ্মুদই সেই ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণ সঠিক পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি উক্ত বিষয়ে তাদের আবেগ-অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জোরদার বক্তব্যসমূহ তুলে ধরেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা সেগুলোর দিকে পুরোপুরি কর্ণপাত করে নি। একটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তিনি লিখেন ঃ **'প্রশ্ন ফিলিস্তিনের নয়। প্রশ্ন মদীনার নয়। প্রশ্ন জেরুজালেমের নয়। প্রশ্ন স্বয়ং মক্কা মুকাররমার। প্রশ্ন যায়েদ ও বকরের নয়, বরং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র (সঃ) ইজ্জতের। শত্রু নিজেদের অসংখ্য বিভেদ-বিরোধ সত্ত্বেও ইসলামের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুসলমানরা কি নিজেদের সহস্র-সহস্র ঐক্যের অভিন্ন বিষয় সত্ত্বেও এই উপলক্ষ্যে একজোট হতে পারেন না?!** "আল-কুফ্রু মিল্লাতুন ওয়াহেদাতুন" পুস্তিকার অংশ বিশেষ, যা আরবের ভেতরে ও বাইরেও অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। অনুরূপ ভাষায় তিনি (রাঃ) মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের অগাধ ভালবাসাকে নাড়া দিয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব যে সব খেদমত ও অবদান রাখেন তা পৃথক একটি অধ্যায়। সে-সম্পর্কে (পাকিস্তানের একজন সাবেক প্রধান মন্ত্রী) জনাব মুহাম্মদ আলী সাহেব তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'পাকিস্তান'-এর ৩৬০ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তিনি আহ্মদী তো ছিলেন না। বগুড়ার সম্ভ্রান্ত পরিবারের অত্যন্ত ভদ্র ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন তিনি। অতি স্পষ্ট ভাষায় তিনি চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খানকে সপ্রশংস শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন এই মর্মে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উদ্ভূত কাশ্মীর সমস্যার সমর্থনে জাফরুল্লাহ্ খান (জাতিসংঘে) যেসব জোরালো সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোথাও আপনারা খুঁজে পাবেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁর অব্যাহত চেষ্টা-প্রয়াসের সুদীর্ঘ বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

প্যালেস্টাইন ইস্যু প্রসঙ্গে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)। তারপর জাতিসংঘে চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব এ বিষয়টিকে এতো দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে উত্থাপন করেন যে, কোথাও এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্যালেস্টাইন ইস্যুর ওপর তিনি পাঁচ-পাঁচ ঘন্টা স্থায়ী বিস্ময়কর বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন, ইতিহাসের এরূপ এক সন্ধিক্ষণে, যখন ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমেরিকা এবং ইহুদীদের যোগসাজশে এর সব আয়োজন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় - **জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভারি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ ভোট দিবেন বলে তারা নিশ্চিত–ঠিক সেই মুহূর্তে জাফরুল্লাহ্ খান দাঁড়ালেন এবং কোন পূর্ব-প্রস্তুতি ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিকভাবে এরূপ সারগর্ভ ও তেজদীপ্ত বক্তৃতা প্রদান করলেন যে, (জাতিসংঘে) মুসলমান প্রতিনিধি যতজন ছিলেন তাঁরা সবাই অভিভূত হয়ে জোশের সাথে উঠে দাঁড়াতেন এবং বক্তৃতা শেষে অনেকে এসে অশ্রু সজল নয়নে তাঁর হাত চুম্বন করে বলতেন, 'জাফরুল্লাহ্ খান! আপনি ইসলাম ও ফিলিস্তিনের সমর্থনে যথাযথ হক্ আদায় করে দিয়েছেন।'** পরবর্তীতে এ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হয় তা এতো বিপুলসংখ্যক যে, সেই দীর্ঘ বিবরণে আমি যেতে পারি না। শুধু এটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, আমেরিকা এবং ইহুদীচক্রের সার্বিক চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ সময় বিভিন্ন দেশের যে সকল প্রতিনিধি জাতিসংঘে মজুদ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশ চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণের দরুন প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লেন। ঐ সময় যদি ভোট গ্রহণ করা হতো, তাহলে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাশ হওয়া অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায়, তাদের চিরায়ত 'দাজাল'-এর স্বভাব অনুযায়ী আমেরিকা এ প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করে প্রশ্ন উত্থাপন করলো যে, 'এই ইস্যুটি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই এই মুহূর্তে ভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে না।' কেননা, তারা জানতো যদি তখনই ভোট নেওয়া হতো, তাহলে ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন প্রশ্ন বা অবকাশই থাকতো না। অতএব, ভোট অনুষ্ঠানের জন্য আমেরিকা সময় চেয়ে নিলো এবং বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট সমস্ত দেশের (সরকারগুলির) উপর চাপ সৃষ্টি করলো যে, 'অমুক অমুক তোমাদের প্রতিনিধি যারা এখন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে রয়েছে তাদেরকে আদেশ বলে জবরদস্তি বাধ্য কর তারা যেন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়, বিপক্ষে যেন না দেয়।' এমনি ধারায় যখন সব রকম গণনা ঠিক করে নিল এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলো যে, এবার ভোট অনুষ্ঠিত হলে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষেই হবে, তখন তারা ভোট অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ জানালো। (তাদের প্রস্তাবটির পক্ষে-বিপক্ষে ভোট প্রদানের) ঐ সময়টিতে এরূপ অবস্থা ও দৃশ্যপটের উদ্ভব হলো যে, কতিপয় প্রতিনিধি ক্রন্দনরত অবস্থায় জাফরুল্লাহ্ খানকে বলছিলেন, 'আমাদের কোন দোষ নেই – আমরা এখনো এই সিদ্ধান্তে স্থির যে, ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আদৌ বৈধ নয়, কিন্তু আমাদের

সরকারের হুকুম মানতে আমরা বাধ্য।' এইরূপে অত্যন্ত সামান্য সংখ্যাধিক্য ভোটের ব্যবধানে তাদের ঐ সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, যা ইতোপূর্বে ঐ সময়েই বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ব্যবধানে নাকচ হয়ে যেত, অর্থাৎ উল্লেখিত প্রথম পর্বে উত্থাপিত এই প্রস্তাবের উপর চৌধুরী মোহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান যে ভাষণ দান করেছিলেন তার পরেই যদি ভোট অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে ঐ প্রস্তাব নাকচ হয়ে যেত। এরপর কী হলো? কীভাবে আরব প্রতিনিধিরা চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খানের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার গীত গেয়েছেন? কীভাবে সমস্ত আরব দেশের পত্র-পত্রিকা চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খানের (ঐ ভাষণের জন্য) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে? ঐ সকল মন্তব্যে এরূপও লেখা হয়েছে যে, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরে ইসলামের প্রাথমিক যুগ ছাড়া আজ পর্যন্ত কোন যুগেই জাফরুল্লাহ্ খানের চেয়ে ইসলামের সাহায্য-সমর্থনকারী এবং এর সেবায় আত্মনিবেদনকারী অন্য কোন ব্যক্তি আমাদের চোখে পড়ে না।' এই সমস্ত কথাই (পাকিস্তানে) এখন ভুলানো হয়েছে। এই সব বিষয়ই সজ্ঞানে মুছে ফেলা হচ্ছে। সেই ইতিহাসকে, যা জাতিসংঘের নথিপত্রে সংরক্ষিত, (বর্তমান) পাকিস্তান তা উপেক্ষা করে বসেছে। কীরূপ এই ন্যায়নীতি? কী ধরনের এই ইতিহাস? অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্ম ও ইতিহাসবেত্তারা এদের রচিত এই সব (ভিত্তিহীন ও প্রক্ষিপ্ত) ইতিহাসের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবে। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আপততঃ তাদের পাল্লা ভারী। কোন কিছুর নাম যা-ই তাদের মনে চায় তা-ই তারা রাখলে রাখতে পারে। নিজেদের মরুভূমিকে তারা জান্নাতসদৃশ বললে বলুক, কিন্তু তা কখনও সেই জান্নাত সদৃশ্য হতে পারে না যার উল্লেখ কুরআন করীমে রয়েছে – এতদোভয়ের মাঝে দূরতম সাদৃশ্য ও সম্পর্ক নেই।

(আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক সাধিত দেশ ও জাতির সেবা ও অবদান সম্পর্কে) সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার পর এখন আমি (পাকিস্তানের) পারমাণবিক শক্তির স্থাপনা এবং এর (ঐতিহাসিক) পটভূমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করতে চাই। এ প্রসঙ্গে সবচে' প্রথম কথাটি তো এই যে, এর গোড়াপত্তন বা সংস্থাপনের মুকুট যে ভুট্টো সাহেবের শিরে স্থাপন করা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর মুকুট যদি কারও মাথায় রাখা যায় তিনি হচ্ছেন জেনারেল আইয়ুব খান। জেনারেল আইয়ুব খানের মাধ্যমেই 'এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন' গঠন এবং এর কাজ আরম্ভ হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, গওহর আইয়ুব সাহেব স্বয়ং তাঁর পিতার কীর্তি ও অবদানের স্বীকৃতি দিতে ভয় পান। সুতরাং ১৯৬৫-এর যুদ্ধের ফলে যে-সব অবস্থার উদ্ভব হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল আইয়ুব খান সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আমাদেরকে অনিবার্যতঃ অবধারিতভাবে এ্যাটমিক এনার্জি গড়ে তোলার দিকে মনোযোগী হতে হবে। নচেৎ, আমরা ভারতের ন্যায় প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় বরণে বাধ্য হবো। এবং অসম্ভব কিছু নয় যে, ভারত আমাদের দেশ দখল করে নিবে। কাজেই এর একটাই প্রতিকার হচ্ছে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ সাধন। **এতোদ্দেশ্যে আইয়ুব খানের নির্বাচনী দৃষ্টি যে বিজ্ঞানীকে খুঁজে পেল যাঁর ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল তিনি ছিলেন ডঃ আব্দুস সালাম।** এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মৌলিক খেদমত ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে ডঃ আব্দুস সালাম এরূপ ভূমিকা রেখেছেন যে, কোনও ঐতিহাসিক যদি সে ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকে, কখনও তা বিস্মৃত ও উপেক্ষা করতে পারে না। এবং তিনি এই ব্যাপারে এরূপ গোপনীয়তা পালন করেন – (যে সম্পর্কে এরা বলে থাকে যে, সবখান থেকে আহ্মদীদেরকে এরা সরিয়ে দিচ্ছে এজন্যে যে, তারা কিনা গোপন রহস্য অন্যদেরকে জানিয়ে দেয়) কিন্তু ডঃ আব্দুল সালাম সাহেব এতো গোপনীয়তা রক্ষা করেন এতদ্সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে যে, এসব কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও যখন আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে থাকে তখনও তিনি পারমাণবিক শক্তির বিকাশে তাঁর ভূমিকা ও অবদানের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। হাল্কাভাবে ভাসা-ভাসা উল্লেখ অবশ্য কখনও কখনও করেছেন এবং অস্পষ্ট ধারণা এই দিয়েছেন যে, পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত যে কাজ হয়েছে তা তাঁর পরে হয়েছে। মিথ্যে তো বলতে পারতেন না কিন্তু ইম্প্রেশন এই দিয়েছেন। কী কথার দরুন আমার মনে এই অস্পষ্ট ধারণার রেখাপাত হয়েছিল তা আমার স্মরণ নেই। কিন্তু আদতেই তাঁর মধ্যে আত্মপ্রচারের প্রবণতা বা স্বভাব বিন্দুমাত্রও ছিল না। আল্লাহতাআলার ফযলে তিনি সত্যিকারার্থে পরম বিনয়ী স্বভাবের ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি পাকিস্তানের একজন নাগরিক হিসেবে এবং আইয়ুব খান যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন তাঁর ওপরে, তা তিনি পুরোপুরি সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন। যতগুলো 'এ্যাটমিক নিউক্লিয়ার কমিশন' গঠিত হতে থাকে সেগুলোর মাধ্যমে ইউরেনিয়াম প্রবৃদ্ধির যে-সব ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও কার্যকর হতে থাকে, ঐ সবকিছুতে ডঃ আব্দুল সালামের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী যে সকল বিজ্ঞানী জড়িত ও নিয়োজিত হন, তাদের মধ্যে বহুল সংখ্যক আহ্মদী বিজ্ঞানীও ছিলেন। যদি ঐ সকল আহ্মদী বিজ্ঞানীরা-ও-সব ব্যবস্থাপনার কাজ (সম্পন্ন) না করতেন তাহলে আজ কোনও পারমাণবিক বোমা তৈরী বা বিস্ফোরণের প্রশ্নই উঠতো না পাকিস্তানের পক্ষে। আর এই অপবাদ যে, তারা নিজেদের গোপনীয় সংবাদ আহ্মদীদেরকে দিয়ে থাকেন – এটা এতো মিথ্যা এবং বাজে যে, আজ যখন এই ঘটনা (বিস্ফোরণ) ঘটে গেল, তখন আমেরিকা থেকে ডঃ আব্দুল লতীফ সাহেব, যিনি ঐ সময় (প্রাথমিক ও মৌলিক কার্যক্রমে) শীর্ষপর্যায়ের ভূমিকা পালনকারী ছিলেন, তিনি এই প্রথমবারই আমাকে পত্র লিখে জানালেন যে, "এ সবই তারা (এখন) মিথ্যে বলছে। ব্যাপার আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আইয়ুব খানের আমলে এ কাজের সূচনা হয় এবং আমি ঐ সকল বিজ্ঞানীদের অন্যতম, যারা প্রাথমিক ও প্রধান মৌলিক কাজ সমাধা করেন ইউরেনিয়াম প্রবৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষেত্রে। আর দীর্ঘকাল ব্যাপী এক্ষেত্রে আমি কাজ করেছি। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশে সফর করেছি এবং প্রক্রিয়াকরণের এই যাবতীয় কাজ যা সম্পূর্ণ সংগোপনে সমাধা করা হয়েছিল – তা যদি তখন সম্পূর্ণ করা না হতো, তাহলে আজ পাকিস্তানের পক্ষে পারমাণবিক বোমা বানাবার স্বপ্ন দেখাও সম্ভবপর হতো না। সুতরাং, প্রথমতঃ স্মরণ রাখুন যে, এর সাফল্যের মুকুট (জুল'ফিকার আলী) ভুট্টোর শিরেও নয়, (জেনারেল) জিয়াউল হকের শিরেও এবং নেওয়াজ শরীফের শিরেও নয় এঁরা হচ্ছে পরবর্তীতে সস্তা শহ্রত (ও অন্যের কৃতিত্ব) লুণ্ঠনকারী লোক। কৃতিত্বের মুকুট প্রকৃতপক্ষে যদি কোন পাকিস্তানির শিরে স্থাপিত হয় তাহলে তিনি হচ্ছেন জেনারেল আইয়ুব খান। বড়ো গভীর ব্যক্তিত্ব (সম্পন্ন মানুষ) ছিলেন তিনি, যাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দেশ

ও জাতির স্বার্থাবলীর ওপর। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি সাধা-সিদে জেনারেল ছিলেন কিন্তু অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম তাঁর দৃষ্টি দেশের ও ইসলামের স্বার্থাবলীর ওপর পতিত হতো, আর এরই ফলশ্রুতিতে ঐ এ্যাটমিক কমিশনের গোড়াপত্তন হয়। তাঁর মাঝে অনেক বড়ো এক সদ্‌গুণ ছিল এই যে, নীরব কর্মীর ভূমিকায় নিঃশব্দে কাজ করতেন তিনি এবং আত্মপ্রচারের মোটেই পক্ষপাতি ছিলেন না। এই কারণেও ঐ সময়কার ইতিহাসকে ভুলানো হয়েছে। নচেৎ, ঐ সময় যদি তিনি খোলামেলা কথা বলতেন তাহলে ব্যক্তিগত খ্যাতি তো তিনি লাভ করতে পারতেন, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি পাকিস্তানের এ্যাটমিক প্রোগ্রামের ওপর পতিত হতো এবং ঐ সময়ই হস্তক্ষেপ ক'রে তারা এর ভিত্তিই গড়তে দিতো না। সুতরাং, নিজের আত্মম্ভরিতার মোটেই খেয়াল করেন নি তিনি এবং আস্থা স্থাপন করেন কেবল আহ্‌মদীদের ওপরই, আর ডঃ আব্দুস সালাম যে-সব বিজ্ঞানীদের নাম পেশ করেন, তাদের সবাইকে গ্রহণ করেন। তাদের মাঝে সবচে' বড় নামটি হচ্ছে ডঃ মুনির আহ্‌মদের। ডঃ মুনির আহ্‌মদ একজন অত্যন্ত সাহসী ও নীতিবান মহৎ ব্যক্তিত্ব তিনি এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে বিশাল ভূমিকা পালন করেন।

পরবর্তীতে এ কাজটিকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অনেক বড়ো মাপের অবদান রয়েছে। তিনি খোলামেলা স্বীকার করে থাকেন যে, তিনি ডঃ আব্দুস সালাম কর্তৃক এই কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং তাঁরই আস্থার দরুন তিনি এই সুযোগ ও সামর্থ্যলাভ করেছিলেন। এখন মুনির আহ্‌মদ খান আল্লাহ্‌র ফযলে জীবিতই আছেন। এই সমস্ত লোক পরস্পরের মধ্যে যত ইচ্ছা কাড়াকাড়ি ক'রে কৃতিত্বের গৌরবে নিজেদের ভাগ বসাতে চায় বসাক, তাতে কিছু আসে যায় না। তবে ডঃ মুনির আহ্‌মদ খানের কাছে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, 'বলুন তো এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সূচনায় সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কে রেখেছেন?' তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি বলবেন, 'ডঃ আব্দুস সালাম।' বস্তুতঃ তিনি যে প্রবন্ধ প্রণয়ন করেছিলেন ডঃ আব্দুস সালাম সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পর, যে প্রবন্ধটি ট্রিস্টে গঠিত হয়, তাতে অত্যন্ত খোলাসা ক'রে তিনি ডঃ আব্দুস সালামের মাহাত্ম্যের গীত গেয়েছেন তাতে নিশ্চয় তিনি ডঃ সালামের এ সব অবদানও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। কেননা, এতদ্‌সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে অভ্রান্ত ও সুনিশ্চিতরূপে কোন অ-আহ্‌মদী বিজ্ঞানীর জানা থাকলে তবে তিনি হচ্ছেন ডঃ মুনির আহ্‌মদ খান সাহেব। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, অ-আনুষ্ঠানিক বৈঠকে যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে নিশ্চয় তিনি তা জানাবেন। কিন্তু এই সূচনাকালের ইতিহাস সম্পর্কে (ঐ প্রবন্ধটিতে) তিনি কেন উল্লেখ করেন নি? (হয়ত) এজন্যেই যে, পাকিস্তান সরকার, পাকিস্তানী মিডিয়া এবং পাকিস্তানী পত্র-পত্রিকা তা বহনকারী-ই হতে পারবে না। যথাসম্ভব তিনি সমস্ত সত্যই তুলে ধরেছেন, কিন্তু সেখানে প্রবন্ধটি থেকে ঐ বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে, সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে। মোদ্দাকথা, এখন যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি পারমাণবিক শক্তিধর হিসেবে পাকিস্তানের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর পেছনে সর্বপ্রথম ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন আইয়ুব খান, তারপর সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন ডঃ আব্দুস সালাম।

ডঃ আব্দুস সালাম ইউরেনিয়ামের প্রবৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে, ডেরাগাজীখানে ইউরেনিয়ামের প্রাকৃতিক ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হবার পর উহা কীরূপে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারোপযোগী করা যায় সে সম্পর্কে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দান করেন এবং ডঃ আব্দুল লতিফ সাহেব, যিনি একজন আহ্‌মদী বিজ্ঞানী, তিনিই সেই বিজ্ঞানী যিনি উক্ত কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নীরবতার সঙ্গে, আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে কোনও কৃতিত্ব (Credit) লাভের চেষ্টা ব্যতিরেকে পরম গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ করতে থাকেন। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে আমি তুলে ধরতে পারি না, কিন্তু সমস্ত বিবরণ আমার নিকট মজুদ রয়েছে। যদি আমি ঐ সব বিবরণ বর্ণনা করি তাহলে দুনিয়া বিস্ময়াবাক হবে যে, কতো নীরবতার সঙ্গে আহ্‌মদী বিজ্ঞানীগণ ঐ সব করণীয় কর্তব্য পালন করেছেন যা ব্যতিরেকে পাকিস্তানে পারমাণবিক শক্তি বিকাশের কোন কার্যক্রমই চলতে পারতো না। দূরদূরান্তে কোন নিভৃত স্থানে ল্যাবরেটরী নির্মাণ ক'রে সেগুলোকে গড়ে তুলতে থাকেন। আজ যে-সব ল্যাবরেটরী তৈরী হয়েছে সেগুলো ঐ সব ল্যাবরেটরির নকশায়-নমুনায় তৈরী হয়েছে যা তাঁরা তৈরী করে দেখিয়ে গেছেন। অতএব, ব্লু প্রিন্টও তাঁদের প্রস্তুতকৃত এবং ব্লু প্রিন্টকে কার্যকরী রূপদানেও তাঁরাই সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী কালে যখন সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তাদেরই প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনাকে বাড়ানো হয়। আরেকজন আহ্‌মদী বিজ্ঞানী শেখ রফিক আহ্‌মদ সাহেব যিনি আমেরিকায় অবস্থান করেন তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় এই সমস্ত ঘটনার পরে। এ থেকে আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন যে, আমিত্ব প্রকাশের কোনও প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটেনি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সমীচীন-ই মনে করেন নি, যাতে আমাকেও জ্ঞাত করেন পূর্বে এ প্রসঙ্গে কী কী কাজ করেছিলেন। তিনি আরও কয়েক জন বিজ্ঞানীর নাম লিখে পাঠিয়েছেন।

ডঃ মুনির আহ্‌মদ খানের নেতৃত্বে যে টীম গঠন করা হয়েছিল সে'টিতে যে-সকল আহ্‌মদী বিজ্ঞানী প্রধান প্রধান শীর্ষপদে নিযুক্ত (ও কর্মরত) ছিলেন তাদের মাঝে একজন ডঃ শেখ লতিফ আহমদও ছিলেন, যিনি এখন আমেরিকায় আছেন। দ্বিতীয় জন কানাডায় অবস্থানরত ডঃ মির্যা মুনাওয়ার আহ্‌মদ সাহেব। আরও অনেক বিজ্ঞানীর নাম রয়েছে, যেমন ডঃ মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ এরশাদ সাহেব (টরেন্টো, কানাডায় অবস্থানরত), যিনি 'নিউক্লিয়ার ফিউয়েল ম্যানেজমেন্টে' অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেন। ডঃ লতিফ আহ্‌মদের ভূমিকা ছিল ১৯৬১ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত। 'ম্যানুফ্যাক্চার অফ নিউক্লিয়ার ইকুইপমেন্ট' তাঁরই অবদান। ১৯৭২ সনে 'ম্যানুফ্যাকচার অফ ইউরেনিয়াম এক্সটেনশান পাইলট প্লান্ট' তিনিই প্রস্তাব ও প্রণয়ন করেন এবং নিজের উপস্থিতিতে তৈরী করে দেখিয়ে দেন যে, ইহা কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং কার্যতঃ হতে পারে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত 'প্রসেসিং অফ ইউরেনিয়াম ম্যানুফেকচারিং নিউক্লিয়ার ফিউয়েল' তাঁরই কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

এখন এরা যথেচ্ছ কৃতিত্ব নিজেদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করুক। উল্লেখিত বিষয়গুলো হচ্ছে ঐ সব অখণ্ডনীয় বাস্তব সত্য, যা পাকিস্তানের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এবং এই সব বাস্তবতাকে এরা কখনও মেটাতে ও মুছে দিতে পারে না। সেজন্য আব্দুল কদীর খান সাহেবের কথাই হোক অথবা অন্য কোন বিজ্ঞানীর, প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত আহ্‌মদী বিজ্ঞানীরাই এ ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছেন এবং গভীর তাত্ত্বিক অবদান রেখে গেছেন। পাকিস্তানে আজকের পারমাণবিক বোমা তাদের কাছে ঋণী।

এই যেমন বলা হচ্ছে যে, আব্দুল কদীর সাহেব ফিউয়েলে কাজ করেন এবং বাদবাকী সব কাজ অন্যেরা করেছেন। এ সবই অসত্য। আব্দুল কদীর সাহেবের তো কোন পজিশনই ছিল না। তার নাম কোন গণনার মধ্যেই ছিল না। প্রপাগাণ্ডার স্পেশ্যালিস্ট বটে তিনি। এ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, কীভাবে কতিপয় সাংবাদিককে তিনি কিনেছেন এবং নিজের পকেট থেকে টাকা পয়সা খরচ ক'রে তাদেরকে তাঁর পক্ষে ও সমর্থনে লিখতে রাজী করেছেন। এখন এ সব তথ্যই পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় ছেপে সংরক্ষিত রয়েছে। এ সবের বিবরণে আমি যেতে চাই না। কেননা, আব্দুল কদীর সাহেবের কর্মকাণ্ডের ভরাডুবি হোক তা আমি পসন্দ করি না। বেচারা ক্রেডিট যা নেওয়ার তা নিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তার জন্য তা মোবারক করুন। কিন্তু ইতিহাস পরিবর্তন করার তাঁর কোন অধিকার নেই। ইতিহাস ঐ সমস্ত কথাই বলছে যা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি।

ডঃ শেখ আব্দুল লতীফ ব্যতীত ডঃ মুনাওয়ার আহ্মদের অবদান সম্পর্কে আমি বলে এসেছি। তেমনি ডঃ মুহাম্মদ আফ্যল সাহেব ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত 'সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার স্টাডীজ' – এ লেক্চারার ছিলেন অর্থাৎ প্রফেসার ছিলেন। এ্যাটমিক এনার্জির বিজ্ঞানীদেরকে 'নিউক্লিয়ার সায়েন্সের টেক্নোলজি বিষয়ে শিক্ষাদানে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এর ফলে টীম তৈরী হয়েছে। বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী লিপ্ত হয়ে থাকেন এ সব কাজে। এই সকল টীম তৈরীর ক্ষেত্রেও আহ্মদী প্রফেসরদের বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই সমস্ত বিষয়কেই আজিকার পাকিস্তান বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে দিচ্ছে এবং এক নতুন ইতিহাসের জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করছে যা সম্পূর্ণ মিথ্যে।

সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় যেহেতু আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপন করি নি সেহেতু আমার অনুমানের চে' কম সময়ই লেগেছে। কেননা, আমার ধারণা ছিল যদি আমি উদ্ধৃতিগুলো পাঠ করে শোনাই তাহলে সময় বেশী লেগে যাবে। সে ভয়েতেই পাঠ করি নি। এখন আমি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে এই খুৎবাটি সমাপ্ত করছি।

বর্তমান যুগ অর্থাৎ যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময় থেকে শুরু হয় এই যুগটিতে এরূপ একটিও বিষয় নেই যা মুসলমানদের স্বার্থ জড়িত ছিল এবং তাতে সঠিক পথ নির্দেশনা এবং আবশ্যকীয় অবদান রাখতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অথবা তাঁর গোলামগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নি, ওরূপ কখনও হয় নি। মুসলিম লীগের ভিত্তিও রেখেছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) । মুসলিম লীগের বিষয়েও আলোচনা করেছেন তিনি। ঐ যুগে নিশ্চয় ইলহামযোগে এ দিকে তাঁর মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে যে, ভারতবর্ষে যত মুসলমান রয়েছে তাদের সবাইকে একত্রিত হয়ে একটি লীগের গোড়াপত্তন করা উচিত। দুঃখের বিষয় যে, আজকের মুসলিম লীগ তাঁর নাম মেটাবার চেষ্টা করছে! কী অদ্ভুত ভূমিকা ও আচার-আচরণ, যা আল্লাহ্তাআলা কখনও গ্রহণ করেন না। তাই এর কুফল কিছু তারা দেখতে পাচ্ছে। আরও কিছু দেখবে। পাকিস্তানের ইতিহাসে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত যে ভূমিকা পালন করেছে সে-সম্পর্কে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থে, যে-সব গ্রন্থ পূর্ববর্তী যুগে ছেপেছে – যেমন, রয়ীস জা'ফরীর গ্রন্থ রয়েছে এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য-গুলোতে সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে যে, "সমগ্র ভারত বর্ষের ধর্মীয় জামাত বা দলীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে যদি কোন জামাত বা দল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও গঠনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে 'জামাতে আহ্মদীয়া'।" এখন এদের প্রণীত স্কুলের পাঠ্য পুস্তকগুলোতে লেখা রয়েছে যে; "মৌলবীরা (অর্থাৎ আহ্রার ও জামাতে ইসলামী জাতীয় মৌলবাদীরা) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আহ্মদীয়া জামাত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ করে।" অতএব, প্রত্যেক বিষয়ে এরা প্রকাশ্য মিথ্যা এবং না-শোক্রীর (কৃতঘ্নতার) আশ্রয় নিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্তাআলা তাদের এই সমস্ত সীমালঙ্ঘন ও ঔদ্ধত্যকে উপেক্ষা করেন তা কখনও হতে পারে না। চিরকালই আল্লাহ্তাআলার এই নিয়ম চলে আসছে যে, আহ্মদীয়া জামাতকে আল্লাহ্তাআলা তওফীক (সুযোগ-সামর্থ্য) দান করে থাকেন। যখন এই লোকেরা উপেক্ষা করে তখন এর শাস্তি তারা পেয়ে থাকে। কাশ্মীরের ইস্যুতে যখন পরিশেষে আল্লামা ইকবাল আহ্মদীয়া জামাতের ২য় খলীফা হযরত মুসলেহ্ মাওউদের মহান উদ্যোগ ও অসামান্য প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করলেন তখন তারপর থেকে কাশ্মীরী মুসলমানদের ওপর যুলুম-অত্যাচারের এরূপ এক যুগ শুরু হয় যার কিছুটা উপশম ঘটায় পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মযলুম কাশ্মীরীদের সাহায্য-সহায়তা পুনরায় শুরু করার সুযোগ ও সৌভাগ্য কারও যদি হয়ে থাকে তাহলে তা হযরত মুসলেহ্ মাওউদের হয়েছিল। কীরূপে এই সমস্ত বিষয়ের দিক থেকে এরা চোখ বন্ধ করে রাখে, তা সত্যিই তাজ্জবের ব্যাপার। বিশ্বাস হয় না, কোন ব্যক্তি এইভাবে বাস্তব সত্য ঘটনাবলীকে জেনে-শুনে উপেক্ষা ক'রে সম্পূর্ণ সেগুলোর উল্টো মনগড়া কথা বানাতে পারে! কাশ্মীরের ইতিহাস প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিসমূহ তো এই মুহূর্তে আমার কাছে মওজুদ নেই কিন্তু মৌখিকভাবেই স্মরণ আছে – তা এই যে, দেশ-বিভাগের পরে পরেই হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) 'রতন-বাগ' (লাহোর) থেকে ঐ শুভ-আন্দোলনটির সূচনা করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে উচ্চপদস্থ আহ্মদী অফিসারগণ তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য আসতে থাকেন এবং বহুসংখ্যক অ-আহ্মদী অফিসারও তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে আসতে থাকেন। কেননা, তাঁর প্রতি তারা আস্থাশীল ছিলেন। সাক্ষাৎকারে তাঁরা বলেন, "এই আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণের যদি কারও যোগ্যতা থেকে থাকে তাহলে তা কেবল আপনারই আছে। সুবা সারহাদ অর্থাৎ পেশাওর প্রদেশে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কয়েকজন আহ্মদী পাঠানকে নিযুক্ত করেন। তাঁরা কাশ্মীরের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। তারপর সংঘবদ্ধভাবে দলের পর দল যেতে শুরু করলো কাশ্মীরের সাহায্য-সমর্থনে, অর্থাৎ পাঠানদের সংঘবদ্ধ দলগুলো। ওদেরকে আহ্মদীয়া জামাতই পাঠিয়েছিল। তারা এ সব কিছুর যা-ইচ্ছা নাম রেখে দিক তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু এ সব হচ্ছে ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। এগুলোকে কোন ভদ্রস্বভাবের মানুষ নস্যাৎ করতে পারে না। ইচ্ছা করলেও পারে না। কেননা, এ সব হচ্ছে ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলো এমনই, যেমন কালক্রমে পাথরের উপরিভাগে রেখা তৈরী হয় যা মেটানো যায় না, এসব ঘটনা বা কীর্তি হচ্ছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনুরূপ রেখা, যা তারা (ইচ্ছা করলেও) নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না।

যেমন কিনা আমি বলেছি, আপনাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সময় বদলে যায়। পূর্ববর্তী জাতিবর্গও অনেক ধৈর্য ধরেছে । অবশেষে প্রকৃত ইতিহাসের রেখাগুলো ঐ মিটিয়ে দেয়া লেখাগুলো

থেকে প্রস্ফুট হতে আরম্ভ করে এবং নতুন ও প্রকৃত রেখাসমূহ সেগুলোর স্থান লাভ করে। অতএব, **জামাত আহ্‌মদীয়াকে আমার উপদেশ এই যে, মনক্ষুণ্ন হবেন না। দুর্বলতা দেখাবেন না। নিজেদের পুণ্যসমূহের ওপর অধ্যাবসায় ও দৃঢ়তা অবলম্বন করুন। জাতিবর্গের ইতিহাস পাল্টে যায়। পরিশেষে ধৈর্যেরই বিজয়লাভের সৌভাগ্য ঘটে। আপনারা দোয়া করতে থাকুন এবং সব্‌র করুন। ধীর-স্থির থাকুন।**

বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের মাথার ওপর অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থাবলী ঘনঘটার ন্যায় ছেয়ে আছে। তা এতো ভয়াবহ যে, সে সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান যদি আপনাদের হয় তাহলে আপনাদের অন্তর কেঁপে ওঠবে। কোনও স্তর ও শাখা-প্রশাখা এমন নেই যা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার শিকার হয়ে পড়ে নি। অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে চলেছে। এটা তো ভুল ধারণা যে, আমেরিকা বা অন্যান্য দেশগুলোর বয়কট বা অবরোধের ফলে পাকিস্তানের কোন অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। এর বড় কারণ হচ্ছে এই যে, এই বৃহৎ জাতিগুলি অত্যন্ত স্বার্থকেন্দ্রিক। যেখানে তাদের নিজেদের স্বার্থ (জড়িত) থাকে যেখানে তারা কার্যতঃ আশঙ্কা বোধ করে যে, তারা সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে-দেশের বাজার অন্য কারও হাতে চলে যাবে, সেখানে তাদের ঘোষণাকৃত পলিসির বিপরীতে ব্যবসা-বাণিজ্যকে বহাল রাখাতে তা (ঘোষণা) কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেজন্য তারা মোটেই কোন পরোয়া করে না। অতএব, এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য যে, সম্পূর্ণ সঠিক বিষয় নির্ণয় করেছেন তিনি। বারবার জাতিকে তিনি নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাদের অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধ সম্পূর্ণ অর্থহীন কথা-বার্তা। বিশেষতঃ এই মুহূর্তে যখন ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ের স্বার্থ একত্র ও অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বলে যে, এতোবড় অর্থনৈতিক বাজার, যা ভারতে ছড়িয়ে আছে এবং যা পাকিস্তানে বিস্তৃত রয়েছে তা উপেক্ষা করার সাধ্য দুনিয়ার যে কোন পরাশক্তির তা আমেরিকান হোক বা কানাডিয়ান অথবা জাপানী এদের কারো নেই। বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেককেই অনিবার্যতঃ নিজের নিজের বাজার ধরে রাখার নিশ্চয়তা যেভাবেই হোক বহাল রাখতে হবে। শুধু একটি ব্যাপার আছে – এ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। নচেৎ, আমাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এই ক্ষতি সাধনে এ লোকেরা সিদ্ধহস্ত। সে-বিষয় বা ব্যাপারটি হচ্ছে, **পাকিস্তানে যতগুলো প্রয়োজন রয়েছে তা সবই পূরণ করার পথে তাদের বাহ্যিক নিষেধাজ্ঞাগুলো কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না, কিন্তু তাদের গোপন এরূপ কতক ইচ্ছা-আকাঙ্খা রয়েছে যা পাকিস্তানকে সংকটে ফেলতে তাদের সহায়ক হতে পারে।** আপাতঃ (সাধারণ) ব্যবসা-বাণিজ্য সে-প্রত্যেকটি স্পটেই অব্যহত থাকবে যেটি তাদের জন্যে লাভজনক হয়ে থাকে। গোপন ব্যবসা, যুদ্ধাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার যার অন্তর্ভূক্ত এগুলোকে এরা রোধ করতে পারে। কিন্তু আদপে এগুলোকেও বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই তাদের। কেননা, পাকিস্তান কোন অন্যান্য দেশ থেকে উল্লেখিত ঐ সব কিছুই কিনতে পারে, আর সেজন্য এদের (এ সংক্রান্ত) ব্যবসা প্রভাবিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে এরা এ ধরনের হুশিয়ারী বা সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে যে, ঐ যন্ত্রপাতি সবই তারা অন্যপথে যোগাড় করে। ঘোষণা যদিও করতে থাকে যে, ভবিষ্যতে পাকিস্তান বা ভারতকে ঐ সব যন্ত্রপাতি কখনও সরবরাহ করা হবে না, যে-গুলো বৃহৎ কম্পিউটার এবং নিউক্লিয়ার টেকনোলজির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরা বলে যে, এগুলো তারা দেবে না; তারপরও ভিন্ন হাত দিয়ে থাকে, অর্থাৎ গোপন হাতে এগুলো সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে থাকে এবং অনেক চড়া দামে করে থাকে। অতএব, অবরোধ বা ক্রাইসিস যাই থাকুক না কেন, তারা তাদের এডভান্টেজের জন্যে ওটা পাল্টে দিয়ে থাকে এবং এই ধারায় নিজেদের স্বার্থ পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় লাভ করে। কাজেই দাম বেড়ে যাবে। আর এই যে চড়া দাম দিতে হবে এটা পাকিস্তানের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করার কারণ হবে। সেজন্যে আমার পরামর্শ এই যে, **দু'টি দেশের পরস্পর যত বিভেদ-মতানৈক্য থাকুক না কেন – আমেরিকা বা বৃহৎশক্তিগুলো অথবা জাপান ইত্যাদির মোকাবেলায় ভারত ও পাকিস্তানের যে-সব ঐক্যমূলক অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে সেগুলোর সম্পর্কে তাদের উচিত মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আপষে লড়াই যদি করতে হয় করুন কিন্তু তাদের উভয়ের পক্ষে অপরিহার্য যে, ঐক্যমূলক অভিন্ন স্বার্থগুলোর ক্ষেত্রে উভয়ে মিলিত হয়ে ফয়সালা করুন। যদি ভারতের চিন্তাবিদগণ এবং পাকিস্তানের চিন্তাবিদগণ এই ব্যাপারটিতে একত্র হয়ে পড়েন এই বলে যে, এগুলো হচ্ছে তাদের উভয়ের অভিন্ন স্বার্থ, যা বিচ্ছিন্নভাবে একা একা সমাধা লাভ করতে পারে না। উভয়ে একত্রিত হয়ে এরূপ পলিসি অবলম্বন করুন, যার দ্বারা পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিগুলোর পলিসি ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ করে দিন। এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে পরস্পর যে-সব পরামর্শ করবেন তা অর্থপূর্ণ পরামর্শ (সাব্যস্ত) হবে। সেগুলো সর্বোৎকৃষ্ট আকারে ফলপ্রসূ হতে পারে। অতএব, যদি (আমার এই কথাটি) না মানেন, তাহলে নিজেদের ক্ষতি করবেন।** কিন্তু অবধারিতভাবে তাদের এ কথা মেনে নেয়া উচিত। মতানৈক্য নিজের জায়গায়, ঐক্যমূলক অভিন্ন স্বার্থসমূহ নিজ জায়গায়। এগুলোকে কেন ক্ষতিগ্রস্ত করতে যান?! তারপর না হয়, লড়তে চান লড়ুন। **তবে আমি চাই না যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হোক। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যদি এতো বাধ্য হয়ে থাকেন যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে, তাহলে লড়তে হয় লড়বেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু পারস্পরিক অভিন্ন স্বার্থগুলোর হিফাযত করার পর ওরূপ করতে হয় তো করুন, তার আগে নয়।** আল্লাহ্‌তাআলা তাদের উভয়কে এর তওফীক দান করুন। উভয়কে আমার একই পরামর্শ। ভারতের কল্যাণ ও জনস্বার্থে অথবা পাকিস্তানের কল্যাণ ও জনস্বার্থে এই পরামর্শটি উভয় দিক দিয়ে অত্যন্ত জরুরী।

(ধারণকৃত ক্যাসেট থেকে সরাসরি শ্রুত ও অনূদিত)

অনুবাদ : **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ**
সদর মুরব্বী।

আহমদীয়া জামাত ও জুমুআর মাঝে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। 'জুমুআ' প্রতিষ্ঠার ওপর আমাদের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভরশীল। নিজেরা জুমুআর নামাযে উপস্থিত হোন আর সন্তান-সন্ততিদেরকে সাথে নিয়ে আসুন। আমি জোর দিয়ে বলছি, আপনারা যুগ খলীফার খুতবা শুনুন আর তদ্দ্বারা উপকৃত হোন।" (খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ৩১/১২/৯২ ইং খুতবা)

উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

(নবম কিস্তি)

কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে এ সবের কোনই সম্পর্ক নেই ঃ উপরোক্ত শিরিকী কেচ্ছা-কাহিনীর সাথে কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ যা রসূল করীম (সঃ) প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন এর কোথাও কোন মিল নেই, প্রকৃতির বিধি-বিধানেরও কোন সম্পর্ক নেই। পশু-পাখীর জন্যে কোন নবীর আগমন হয়েছে এরূপ বিষয় কুরআনের আছে কি? শিক্ষা দিলে মানুষের চেষ্টায় পশু-পাখীরাও অনেক কিছু শিখতে পারে। তবে নিজে নিজে তা পারে না। অন্য পশুপাখীকেও তা শিখাতে পারে না। অনেক সার্কাসই এর প্রমাণ বহন করে। মৃতকে ইহকালে জিন্দা করা আল্লাহ্‌র সুন্নতের বরখেলাপ। কিন্তু সে কাজটা হুযূর (সঃ) দ্বারা করিয়ে ছেড়েছেন তথাকথিত উলামাদের অংশ বিশেষ। তাদের এ ধরনের পুস্তকাদিতেই শুধু নয়, গ্রামে-গঞ্জে শত শত ওয়াজ ও ইদানিং তফসীর মাহফিলে হাজার হাজার লোককে এসব কথা শুনাচ্ছেন, সুরালি আওয়াজে তারা চারিদিকে মুখরিত করে তোলেন। এভাবে তারা রুজি-রোজগার করছেন, উন্নত মানের খানাপিনা খাচ্ছেন। কিন্তু তাতে কেউ হেদায়াতের কোন আলো পাচ্ছে না। এসবে কারো দায়িত্ব পালনের কোন সক্রিয় তাগিদ থাকে না। অশেষ সওয়াবের আশায় শ্রোতারা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কতটুকু শুনেন, শিখেন আল্লাহ্ মালুম। ফলে তাদের হাতে ইসলামও ঝিমিয়ে উঠেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বকে জাগাতে ও জাগ্রত রাখতে যে ইসলামের আগমন, সে ইসলামের নামে নিজেদের আজব খেয়াল খুশীকে মোল্লা ভাইয়েরা জারি করে চলেছেন। তাতে খাঁটি ইসলাম হয়েছে খুঁটিহীন। ঈমান এখন তথাকথিত মু'মিনদের হৃদয় ছেড়ে, মনে হয় 'সপ্তর্ষি মন্ডলে' পাড়ি দিয়েছে। ফলে মুসলিম জাহানে চলেছে দলাদলি হানাহানির প্রবল স্রোত। ঐক্য এখন মুখের বুলিতেই নিঃশেষ হচ্ছে। সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এখন পথ-ভ্রষ্ট। চলেছে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বৃথা কসরৎ। কথায় কথায় যার তার দ্বারা জিহাদ ঘোষণা, ফতওয়া জারি, কাকেও মুসলমান করতে না পারলেও একদল আর একদল মুসলমানকে কাফের বলতে কোথাও কার্পণ্য নেই। এভাবে কোন নির্দিষ্ট দেশই নয় সারা মুসলিম জাহান বিভ্রান্তির অতল সাগরে ডুবে যাচ্ছে। তবে শত আপদ-বিপদ সত্ত্বেও ইসলাম যে ডুবে মরতে এবং মানবতাকে ডুবাতে আসেনি বরং এর সুন্দর শোভন ও কল্যাণময় বিকাশ ঘটাতেই এসেছে সে কথা ইনশাল্লাহ্ পরবর্তী অধ্যায় বলা হবে।

এখন নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় কিছু বলছি। ১৯৪৫-৪৬ সালের কথা। আমি তখন বগুড়ায় জেলা কৃষি অফিসারের পদে আছি। আমার অফিসের একজন কেরানী সাহেবের বিবি মারা গেলে ওনার কুলখানিতে যেতে হয়। মিলাদ শুনছি। মৌলবী সাহেব রসূলে করীম (সঃ)-এর মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে বল্লেন, যেদিন আমাদের প্রিয় নবী মাতৃগর্ভে আসেন সেদিন আরবের দশ হাজার মেয়েলোক তাদের গর্ভে কেন তিনি আসেন নি সে মর্মবেদনায় আত্মহত্যা করে। পড়েন সুবহানাল্লাহ্? আমি আর চুপ থাকতে পারলুম না। বিনয়ের সাথে আরজ করলুম, হুযুর এ কথা কোথায় পেলেন? যেদিন সন্তান মাতৃগর্ভে আসে, মা-ও তা টের পায় না। অন্য মেয়েরা কি করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে মার পেটে আসার প্রথম দিনেই 'নবী' বলে চিনে ফেল্লো! অথচ যখন তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে নবী বলে দাবী করলেন তখন একমাত্র খদীজা (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন মহিলা মানলো না। ১০ হাজার মেয়ের আত্মহত্যার কথাও কেউ উল্লেখ করলো না, একি মেনে নেয়া যায়? তা'ছাড়া আত্মহত্যা বড় পাপ হিসেবে গণ্য হয়। মহানবী (সঃ) এ মহা পাপের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ালেন!

আমার চাকরি জীবনের শুরুতে ব্যাপারটি ঘটে। বয়স কম। তাই হুযূর বল্লেন – তুমি বুঝি ইংরেজী পড়েছ? হাঁ, বলায় হুযূর বল্লেন, তুমি এ দরবার থেকে বের হয়ে যাও। মৃতের উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান। তাই কথা না বাড়ায়ে বের হওয়ার জন্য দাঁড়াতেই কিছু ছাত্র বলে উঠলো, না, আপনি যাবেন না। হুযূরকে কুরআন হাদীস থেকে এর প্রমাণ দিতে হবে। হুযূরের চক্ষুতো ছানাবড়া! তখন আমি বল্লাম, কুরআন ও সহী হাদীসে এসব গাল-গল্প পাবেন না। 'বটতলার' বাজে বই-পুস্তকে পাবেন। একথা শুনা মাত্র হুযূর বলে উঠলেন 'তিনি' [তুমি থেকে আমি তিনি হয়ে গেলাম] ঠিকই বলেছেন।' বগুড়া শহরের বাজারে একটি বট গাছ আছে। ওখান থেকে হুযূর একটি বই কিনেছিলেন। তাতেই তিনি এসব কথা পড়েন। নিজের কথা আর না বলে দুই বন্ধুর কাছে শুনা তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলছি। প্রথম বন্ধু বলছিলেন, এক ওয়াজ মহফিলে শুনেছেন হুযূর (সঃ)-এর আব্বার বিয়ের বয়সে যখন রাস্তায় বের হতেন তখন বিবাহযোগ্য মেয়েরা ওনাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতেন। কারণ ওনার কপালে বিশ্বনবীর পিতা হওয়ার চিহ্ন ছিলো। যখন আমেনার সাথে বিবাহ হয়ে গেলো তখন থেকে আর কেউ ওনাকে বিরক্ত করে নি। কেননা, ঐ চিহ্ন মুছে গেছে। দ্বিতীয় বন্ধু বলছিলেন তিনি এক মিলাদ মহফিলে শুনেছেন – এক ইহুদী হুযূর (সঃ)-এর দরবারে গিয়ে বল্লেন, আপনি যদি আমার মুঠোতে কি আছে বলতে পারেন তবে আপনি সত্য নবী। হুযূর (সঃ) বল্লেন, আমি কিছু বলবো না। আপনার হাতে যা আছে ওটাই যদি বলে দেয় তবে কি হবে। ইহুদী বল্লেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। এ কথার সাথে সাথে ইহুদীর হাত হতে জোরে উচ্চারিত হতে লাগলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'। ঐ ইহুদী তখন তখনই মুসলমান হয়ে গেলেন। ওনার হাতে ছিলো টিকটিকির একটা মৃত বাচ্চা। পড়েন সুবহানাল্লাহ্।

আল্লাহ্ যুক্তি-প্রমাণ ও নিজেদের জীবনাদর্শ অনুসরণের সুফল দেখিয়ে মানুষকে সত্য-সুন্দরের দিকে আহ্বান জানাতে তাকিদ দিয়েছেন। মোল্লা ভাইয়েরা সে মহান শক্তি হারিয়ে কল্পিত 'টিকটিকির ভরসা' হয়ে পড়েছেন। আহ্ এ চিত্র কতই না বেদনাদায়ক!

ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কল্পিত মু'জেযার মানসিকতায় বিভোর মোল্লা ভাইয়েরা যেভাবে রসূল (সঃ)-কে বিশ্ব দরবারে পেশ করছেন তা কোন যুগের জন্যই যে উপযোগী নয় তা বিনা দ্বিধায় জোর গলায় বলা যায়। কারণ এ ধরনের বক্তব্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণমূলক তেমন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া আল্লাহ্ নবী-রসূলকে প্রেরণ করেন যাতে তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে মানব জীবনকে সুন্দর-শোভন ও সার্থক করে তুলতে পারে। কিন্তু ধর্মান্ধ স্বার্থান্ধদের উচ্চারণ ও আচরণে সুস্থ-সবল ব্যবহারিক জীবনের খোরাকি পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাদের মহফিলগুলো ডাকা হয় জীবন গড়ার উপাদান সংগ্রহের জন্য নয়, তথাকথিত সওয়াব হাসিলের জন্য। বাস্তবে এসব মহফিল উম্মাহ্ ও রসূল করীম (সঃ)-এর মাঝে ব্যবধানই বাড়িয়ে চলেছে।

– মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী

ওকাআতে শীরী

(আনন্দের ঘটনাবলী)

একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য পুস্তক

সংকলন : মির্যা খলীল আহমদ কমর

(দ্বিতীয় কিস্তি)

পুণ্য কর্মের প্রতিদানগুলো বিনষ্ট হয় না

"আমার মনে এসেছে, তাযকেরাতুল আওলীয়া পুস্তকে আমি পড়েছিলাম যে, নব্বই বছর বয়সের এক বৃদ্ধ অগ্নি উপাসক ছিলো। ঘটনাক্রমে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হলে তিনি ছাদে পাখীদের জন্যে শস্য দানা ছড়াচ্ছিলেন। কোন বুযর্গ পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। বল্লেন, হে বৃদ্ধ তুই কী করছিস? তিনি জবাব দিলেন, ভাই, ছয় সাত দিন একাধারে বৃষ্টি হচ্ছে। পাখীদের জন্যে শস্য-দানা ছড়াচ্ছি। তিনি বল্লেন, তুই তো বেহুদা কাজ করছিস। তুই তো অবিশ্বাসী কাফের তোর কী পুরস্কার মিলবে? বৃদ্ধ বলে দিলেন, আমি অবশ্যই এর প্রতিদান পাবো।

বুযর্গ ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বলেন, আমি হজ্জে গেছি। দূর থেকে দেখি কি ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি তওয়াফ (মক্কার কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করা – অনুবাদক) করছেন। তাকে দেখে আমি খুবই আশ্চার্যান্বিত হলাম এবং যখন আমি সামনে এগুলাম তখন প্রথমে ঐ কথাই বল্লেন, আমার শস্য-দানা ছড়ানো কি বৃথা গেলো না উহা প্রতিদান পেলাম? এখন মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌তাআলা একজন কাফেরের পুণ্যকর্মের প্রতিদানকেও নষ্ট করেন নি। তাহলে কি মুসলমানের পুণ্যকর্মের প্রতিদান বিনষ্ট করে দিবেন?" *(মলফুযাত, প্রথম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)।*

একজন বুযর্গের নিমন্ত্রণ

"মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) ব্যক্তি মন্দ পরিত্যাগ করার তাৎপর্য ভালভাবে অবহিত এবং উপকারীর কল্যাণ বৃদ্ধি করতে প্রত্যাশী। আমি এ ব্যাপারে একটি কাহিনী পড়েছি।

এক বুযুর্গ কাউকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে অতিথি সেবার ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করলেন না। পুরোপুরি অতিথি সেবার দায়িত্ব পালন করলেন। যখন তিনি খাবার শেষ করলেন তখন বুযর্গ বল্লেন, আমি আপনার যথাযোগ্য সেবা করতে পারিনি। অতিথি বল্লেন, আপনি আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন নি বরং আমি আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছি। কেননা, যে সময় তুমি (আমার সেবায়) নিয়োজিত ছিলে আমি যদি তখন তোমার সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দিতাম তাহলে কী হতো"? *(মলফুযাত, প্রথম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা)।*

তিন হজ্জ

"আমার ধারাবাহিক একটি দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী মনে পড়ছে। কোন দুনিয়াদার ব্যক্তি কোন বুযর্গকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যখন ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি খাবার খাওয়ার জন্যে বসে গেলেন তখন ঐ আত্মম্ভরী দুনিয়াদার স্বীয় চাকর-বাকরকে বল্লেন, অমুক থালাটা নিয়ে এসো যা আমি প্রথম হজ্জ থেকে এনেছিলাম। আবার পরে বল্লো, দ্বিতীয় থালাটাও নিয়ে এস যা আমি দ্বিতীয় হজ্জের সময়ে এনেছিলাম। এর পরে বল্লো, তৃতীয় হজ্জের সময়ের থালাটিও নিয়ে আসবে। ঐ বুযর্গ বল্লেন, তুই তো খুবই করুণার পাত্র দেখছি, এ তিনটি বাক্যেই তুই নিজের তিনটি হজ্জকেই বিনাশ করে দিলি! তোর উদ্দেশ্য তো কেবল এই ছিলো যে, তুই ঐ বিষয়ের প্রকাশ করিস যে, তুই তিনটি হজ্জ করেছিস। এজন্যে খোদা শিক্ষা দিয়েছেন যে, কথাকে যেন সংযত করে রাখা হয়। আর অনর্থক ও অযথা ক্ষেত্রে কথা-বার্তা থেকে বিরত থাক দরকার" *(মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২২)।*

ইমাম আবূ হানিফার সৎকর্ম

"হযরত আবূ হানিফা (রহঃ)-এর নিকটে এক ব্যক্তি আসলো। বল্লো, আমরা একখানা মসজিদ নির্মাণ করছি, আপনিও এতে কিছু চাঁদা দিন। তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বল্লেন, আমি এতে কিছু দিতে পারছি না। যদিও তিনি চাইলে অনেক কিছুই দিতে পারতেন। ঐ ব্যক্তি বল্লো, আমি আপনার নিকট বেশী চাই নি কেবল কল্যাণের নিদর্শনস্বরূপ কিছু দিয়ে দিন। পরিশেষে তিনি দু'আনার মত একটি মুদ্রা দিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার সময়ে ঐ ব্যক্তি মুদ্রাটি নিয়ে ফিরে আসলো এবং বলতে লাগলো, হযরত, ইহা তো অচল মুদ্রা। তিনি খুবই খুশী হলেন এবং বল্লেন, বেশ হয়েছে, আসলে আমার মন চাচ্ছিলো না যে, আমি কিছু দিই। অনেক মসজিদ আছে আর আমি ইহাকে অপচয় মনে করি" *(মলফুযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯)।*

স্বল্পে-তুষ্টি

কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি ঘোড়ার চড়ে যাচ্ছিলো। রাস্তায় একজন ফকীর বসে ছিলো। সে খুব কষ্টে-সৃষ্টে তার সতর (একজন মানুষের জন্যে যতটুকু ঢেকে রাখা ফরয। যেমন, পুরুষের জন্যে নাভীর নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মেয়েদের হাতের কব্জি থেকে নিয়ে পায়ের গিরা পর্যন্ত মুখমন্ডল বাদে সর্বশরীর ঢাকা ফরয। কাজের মেয়েদের জন্যে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে –অনুবাদক) ঢাকতে পারছিলো। অশ্বারোহী ফকীরকে জিজ্ঞেস করলো, শাহ্-জ্বী! কেমন আছেন? ফকীর তাকে উত্তর দিলো, যার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে, তার অবস্থা আর কেমন হয়? তার আশ্চর্য মনে হলো তাই বল্লো, তোমার সারা আশা-আকাঙ্ক্ষা কীভাবে পূর্ণ হয়ে গেছে। ফকীর বল্লো, যখন সকল আশা–আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে দিয়েছি তখন সবই যেন পূরণ হয়ে গেছে। শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন সব কিছু লাভ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে তখন কষ্টই হয়ে থাকে; কিন্তু যখন স্বল্পে-তুষ্ট হয়ে সব কিছু ছেড়ে দেয়া হয় তখন যেন সব কিছুই পাওয়া গেল। নাজাত ও মুক্তি ইহাই" *(মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা –৪২২)।*

চল্লিশ প্রদীপ

"একটি বিখ্যাত গল্প। একজন বুযর্গ একটি খাওয়ার আয়োজন করেন এবং তিনি ৪০টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করলেন। কতক লোক বল্লো, এ রকম অপচয় হওয়া উচিত নয়। তিনি বল্লেন, যে প্রদীপটি আমি

রিয়াকারী (আত্মম্ভরিতা) করে আলোকিত করেছি উহাকে নিভিয়ে দাও। চেষ্টা করা হলো কিন্তু একটিকেও নিভানো গেলো না। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, একটিই কর্ম যদিও হয়ে থাকে আর দুই ব্যক্তি উহা করে। একজন উক্ত কর্ম করতে পাপ করে বসে আর অন্যজন পুণ্য করে এবং এ পার্থক্য নিয়্যত বা সংকল্পের বিভিন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়ে যায়" *(মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৭)*।

পুণ্য কর্মের আকর্ষণী-শক্তি

"মানুষের মধ্যে পুণ্য ও মন্দ কর্ম করার একটি আকর্ষণী-শক্তি নিহিত আছে। মানুষ পুণ্য কর্ম করে কিন্তু বুঝতে পারে না যে, কেন পুণ্য কর্ম করে। এমনিভাবে এক ব্যক্তি মন্দ কর্মের দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কোন দিকে যাচ্ছো তাহলে সে বলতে পারে না। এ আকর্ষণী-শক্তি সম্বন্ধে মসনবী রুমী-তে একটি কাহিনী লেখা আছে। এক দুষ্কৃতকারী প্রভুর একজন পুণ্যবান ভৃত্য ছিলো। ভোর বেলা সে ভৃত্যকে নিয়ে বাজার-সদায় করা জন্যে বের হলো। রাস্তায় আযান শুনে চাকর অনুমতি নিয়ে মসজিদে নামায পড়তে গেলো এবং সেখানে তার স্বাদ ও মজা লাভ হলো আর সে নামাযের পরে যিক্‌রে ইলাহীতে মশগুল হয়ে গেলো। পরিশেষে মালিক কতক্ষণ অপেক্ষা করে তাকে ডাকলো এবং বল্লো, তোকে ভিতরে কে ধরে নিয়েছে? চাকর বল্লো, আপনাকে ভিতরে আসা থেকে বাইরে যে টেনে নিয়েছে। মোটকথা একটি হয় আকর্ষণী-শক্তি যার প্রতি খোদাতাআলা ইঙ্গিত করছেন – কুল্লু ইয়্যা'মালু 'আলা শাকিলাহিতী (বনী ইসরাঈল : ৮৫ আয়াত) প্রত্যেক দল নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী পুণ্য কর্ম করে থাকে" *(মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)*।

একজন মু'মিনের ইহলোক ত্যাগ

"আমি ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যার অন্তরের সাথে খোদাতাআলার সম্পর্ক আছে তাকে অপমানজনক মৃত্যু দেন না। এক বুযর্গের ঘটনা পুস্তকে লেখা আছে যে, তার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, তার মৃত্যু যেন তুস্ নামক স্থানে হয়। এক কাশ্‌ফে (দিব্য-দর্শন) তিনি দেখলেন যে, তুস্ নামক স্থানেই মারা যাবেন। পরে তিনি অন্য কোন স্থানে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং জীবনের কোন আশাই থাকে না। তাই তিনি তার শীষ্যদেরকে ওসীয়্যত করেন যে, যদি আমি মরে যাই তাহলে আমাকে ইহুদীদের কবরস্থানে সমাহিত করবে। তারা কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, আমার বড় দোয়া ছিলো আমি যেন তুস্ নামক স্থানে মারা যাই। এখন জানা গেল যে, তা কবুল হয়নি। এজন্যে আমি মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে চাই না। এর পরে তিনি আস্তে আস্তে ভাল হয়ে গেলেন। পরে তিনি তুস্ নামক স্থানে গেলেন, সেখানে অসুস্থ হলেন এবং সেখানেই মারা গেলেন ও সমাধিস্থ হলেন। এমন মু'মিনে পরিণত হওয়া উচিত। যদি মু'মিন হও তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা অপমানজনক মৃত্যু দিবেন না" *(মলফুযাত চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৩)*।

সংকল্প ও নিয়্যত

"একখানা পুস্তকে লেখা আছে যে, জুনায়েদ বোগদাদী আলায়হের রহমতের একবার মনে হলো যে, দেশ-ভ্রমণে যাবেন। আবার মনে হলো কেন যাবেন? তখন বুঝতে পারলেন না যে, কোন্ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাওয়া দরকার। এজন্য পুনরায় ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন, পরে যাওয়ার বাসনা প্রবল হলো। আর তিনি যখন বাসনাকে পরাজিত করতে পারলেন না তখন উহাকে একটি ঐশী আহ্বানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বের হয়ে গেলেন। কোন এক দিকে রওয়ানা দিলেন। সামনে গিয়ে দেখতে পেলেন, একটি গাছের নীচে এক পঙ্গু ব্যক্তি পড়ে আছে। সে তাঁকে দেখতেই বল্লো, হে জুনায়েদ! আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি দেরী করে এসেছ কেন? তখন তিনি বল্লেন, আসলে তোমারই আকর্ষণী-শক্তি ছিলো যা বারে বারে আমাকে বাধ্য করছিলো। এভাবে প্রত্যেক বিষয়ে নিয়তির আকর্ষণী-শক্তি নির্ধারিত হয়ে থাকে। উহা পূর্ণ না হলে স্বস্তি লাগে না। ভ্রমণ করতে হয় তো পুণ্য-সংকল্প নিয়ে করো" *(মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, ৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠ)*। (চলবে)

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ওয়াকফে নও মুজাহেদের সাথে পরিচিত হোন

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ (সুমন), রেফারেন্স নম্বর ৬৯২৪-এ,
পিতা– মোঃ মোমতাজ আলী মিয়া, মাতা– নূরজাহাঁ বেগম,
রাজশাহী জমাত

কামাল উদ্দীন, ৩৯৭৮-এ, শীলা নার্গিস, ৩৯৭৮-এ,
পিতা– অধ্যাপক মোহঃ আব্দুল জব্বার, মাতা– কমরুন নেসা,
হোসনাবাদ জমাত, জামালপুর

বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহে আলায়হো ওয়া সাল্লামের নজীরবিহীন শিক্ষার দর্পণে

(মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ, নাযের আলা কাদিয়ান ১৯৯৬ ইং সালের সালানা জলসা উপলক্ষ্যে এই বক্তব্য রাখেন)

আদম সন্তানের মধ্যে শেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব ছিল নিঃসন্দেহে অতিশয় অসাধারণ ও অপূর্ব। খোদাতাআলার ঘরের ছায়া-তলে লালিত-পালিত এই সার্বজনীন ব্যক্তিত্ব ছিল আবুল আম্বিয়া হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পরিবারভুক্ত ও বংশোদ্ভূত। তিনি তাঁর অতীব মহৎ চরিত্রগুণের কারণে খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টিতে সর্বাধিক সম্মানিত, প্রিয়তম ও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। খোদায়ে আয্‌যাওজাল্লা অতীব মহত্ব ও গৌরবময় শব্দে এই ঘোষণা দিলেন, ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম" অর্থাৎ তুমি চারিত্রিক মানদণ্ডের সর্বোচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান আছো। তাঁর গুপ্ত জীবন সম্পর্কে জ্ঞাতা বিশ্বস্ত সহধর্মিণী বড়ই জোরালো ভাষায় সত্যায়ন করেছেন যে, আপনি সেই ব্যক্তি, যে উত্তমভাবে আত্মীয়তা রক্ষা করেন, সর্বদা বিপন্ন লোকের বোঝা বহন করেন; আতিথেয়তা পালন করেন, যে-সব দুর্লভ ও বিরল চরিত্র, তা আপনি প্রতিষ্ঠিত করেন, বিপদগ্রস্ত লোকের সাহায্য করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) সাক্ষ্য দান করেছেন, "কানা খুলুকুহুল কুরআন" অর্থাৎ কুরআন মজীদে যে সব উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ব্যক্ত রয়েছে সেই সবই তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে, এমন পরিষ্কারভাবে যেন তিনি কুরআনের, জীবন্ত ও জাগ্রত ছবি ছিলেন। এইরূপে গোটা জাতি তাঁকে দু'টি উচ্চাঙ্গের উপাধি "সদূক" ও "আমীন" দ্বারা ভূষিত করে তাঁর দৃঢ় ও ধ্রুব সততা ও বিশ্বস্ততার উপর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছিল। অমুসলমান নেতা আবূ সুফিয়ান ঘোর বিরোধী ও বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও রোম সম্রাট কায়সারের দরবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করতঃ বললো যে, আমরা এই ব্যক্তিকে কোনদিন মিথ্যা কথা বলতে শুনি নি। তাই তো কুরআনে হাকীম অদ্যবধি জগদ্বাসীকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসেছে যে, "ফাকাদ লাবিস্তোফীকুম উমোরান মিন্ কাব্‌লিহী আফালা তাকেলূন" অর্থাৎ এই নবী করীম তোমাদের মধ্যে জীবনের এক বড় অংশ অতিবাহিত করেছে, তোমাদের মধ্যে কেহ আছে, যে তার প্রতি কোন দোষারোপ করতে পারে?

সুধী বন্ধুরা আমার! যেভাবে আমাদের অতীব আদরনীয়, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম খোদার হুকুমে নবুওয়তের দাবী করলেন এবং লোকদিগকে তৌহীদের প্রতি আহ্বান জানালেন তেমনিই মনে হলো যেন তিনি এই কাজ করে অপরাধ করেছেন এবং সব রকমের বিপদ-আপদকে নিজের চতুপার্শ্বে জড়ো করে নিলেন। সকল নবী সম্মিলিতভাবে যত যুলুম-অত্যাচার উৎপীড়ন-নিপীড়ন ও বিপদ-আপদ সহ্য করেছেন তার চাইতে বেশী তাঁকে একা সহ্য করতে হয়েছে। এমন কি নবী দাবী করার পর এই উজ্জ্বল জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। সারা জাহানের হাত তাঁর দিকে এবং একা তাঁর হাত তাদের মোকাবেলায় দাঁড়ালো। দুনিয়ার হাত তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য দাঁড়ালো আর তাঁর হাত তাদিগকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়ালো। তীব্র মোকাবেলা হলো। এমতাবস্থায় এক-অদ্বিতীয় খোদার তরফ থেকে মানুষ মানুষের মধ্যে পরস্পরের ঘৃণা হিংসা-বিদ্বেষ মুছে দেওয়ার জন্য এবং ঈর্ষার স্থলে পরস্পর ভালবাসা ও প্রীতি স্থাপনের জন্য তাঁর উপর মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

ইতিহাস সাক্ষী যে, এই রসূল আরবের চিত্র পরিবর্তন করে দেখিয়ে দিলেন। স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, "কুনতুম্ আদাআন্" যে, তোমরা পরস্পর একে অপরের রক্তপিপাসু শত্রু কিন্তু রহমাতুল্লিল আলামীন সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম "ইদফা বিল্লাতি হিয়া আহ্‌সান"-এর মৌলিক আদেশ অনুযায়ী এমন কার্য সাধন করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এমন ভাবে সকল শত্রুতা ও ঘৃণাকে পদদলিত ও নস্যাৎ করে দিয়ে ইহার স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার যে ঝরণা প্রবাহিত করেছেন, ইতিহাসের পাতায় পাতায় তালাশ করেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

সুধী বন্ধুগণ! আজকের এই মহতী সমাবেশে আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের সেই দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই দিকটি এত ব্যাপক ও গভীর যে, অল্প সময়ের মধ্যে ইহার সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় সুতরাং আল্লাহ্‌র দেওয়া তৌফীক অনুযায়ী অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

অপরাপর ধর্মানুসারীদের সঙ্গে আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের ব্যবহার ঃ

এই বিষয়ে কিছু বলার পূর্বে আপনাদের সম্মুখে এই ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও ব্যবহারের একটি চিত্র উপস্থাপন করা জরুরী মনে করি যাতে করে তাদের মোকাবেলায় রহমাতুল্লিল আলামীনের ব্যবহারের তুলনামূলক মূল্যায়ন করা যেতে পারে, এতদ্‌দ্বারা তাঁর মহত্ব ও উচ্চ ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্ররূপে প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ পালনে হেরা গুহা হতে বের হয়ে সাফা পর্বতে তৌহীদের পতাকা উড়ালেন এবং লোকদিগকে তাঁর নবুওয়ত প্রাপ্তির সংবাদ পৌছালেন তখন বস্তুতঃ সেটা ছিল প্রথম দিন যখন তিনি সকল ধর্মাবলম্বীদিগকে নিজের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট করে ফেললেন এবং ঘোর শত্রুতে পরিণত করে দিলেন। যারা মুশরেক ছিল তারা এই জন্য ক্ষিপ্ত হলো যে, তিনি তাদের শিরক্‌সুলভ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তৌহীদের শিক্ষা পেশ করলেন। যারা ইহুদী ও কিতাবধারী লোক ছিল তারা এই জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো যে, তিনি তাদিগকে নানা রকমের সৃষ্টি পূজো ও পীর পূজো হতে বারণ করলেন এবং তাদেরকে হযরত মসীহ্ নাসেরীর বিরুদ্ধাচরণ ও অপমান করতে নিষেধ করলেন। পক্ষান্তরে হযরত

ঈসা আলায়হেস সালামকে না খোদা, না খোদার পুত্র বলে স্বীকার করলেন, এতে খৃষ্টানদের অন্তরও জ্বলতে থাকলো এবং পরম শত্রুতায় উদ্ধত হয়ে পড়লো। এইরূপে অগ্নিপূজারী ও গ্রহ-নক্ষত্র পূজারী যারা ছিল তারাও ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। কেননা, তিনি তাগিদকেও তাদের দেব-দেবীর পূজাপাট করতে নিষেধ করলেন। মোট কথা, তৌহীদের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সকল ধর্মাবলম্বীগণ তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। কিন্তু আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম খোদার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিতে বিলীন হয়ে কোন দ্বিধা করেন নি যে, তৌহীদ প্রচার করার ফলে কী কী দুঃখ-কষ্ট আমার মাথার উপর এসে পড়বে।

সেই সময়েরই একটি ঘটনা, হুযূর সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহ্‌র পার্শ্বে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় এক ঘোর শত্রু আক্‌বা বিন আবী মুঈত তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে এমনভাবে কষে ধরলো যে, হুযূর আকদসের শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন জানতে পারলেন, তিনি দৌড়ে উপস্থিত হলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"আতাক্‌তোলূনা রাজোলান, আঁইয়াকূলা রব্বিয়াল্লাহো অর্থাৎ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে কেবল এই কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, "আমার প্রতিপালক আল্লাহ্"।

অন্য এক সময়ে যখন হুযূর আকদস (সঃ) তৌহীদের ঘোষণা করলেন তখন মক্কার মুশরিকগণ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হয়ে পড়লো। তাঁর স্ত্রীপক্ষের পুত্র হারিস বিন হালা তাঁকে রক্ষা করার জন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হলে সেই উত্তেজিত ও উদ্ধত দলের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তরবারি নিয়ে তার উপর আক্রমণ করলো এবং সেখানেই তাকে হত্যা করে ফেললো। এই গুলিতো ছিল তাদের দৈনন্দিন কার্য-কলাপের অবস্থা। হুযূর আকদস শান্তির সহিত নামায পড়াটাও তাদের জন্য কষ্টের হতো।

একবার কোন এক দুষ্ট ব্যক্তি হুযূর আকদসের উপর উটের এক দুর্গন্ধময় নাড়ি-ভুঁড়ি রেখে দিলো তখন, যখন তিনি তাঁর প্রিয় প্রভু আল্লাহ্‌তাআলার আস্তানায় সেজদারত ছিলেন। মুশরিকদের নেতারা যাদের মধ্যে আবু জাহল, শায়বা, উতবা শামিল ছিল। তাদের এই কদর্য ও নির্যাতনমূলক কাজের জন্য তারা পরস্পর হাসি-ঠাট্টা এবং আমোদ-আহ্লাদ করতে করতে একে অপরের উপর ঢলে পড়ছিল।

আর যে মুষ্টিমেয় লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন তাদের উপর মক্কার অবিশ্বাসীরা যে সব অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছিল উহার ইতিহাসও এত ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক যে, পড়লে শরীর শিউরে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত আবূ ফাকিয়া (রাঃ)-কে মুসলমান হওয়ার কারণে গরম বালিতে শুইয়ে দেয়া হতো এবং বুকে এত ভারী পাথর রেখে দেয়া হতো যার ভারে তার জিহ্‌বা বের হয়ে আসতো।

সোহায়ব বিন সানানকে এত ভীষণ মারপিট করা হলো যে, ফলে তার অনুভূতি শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল। হযরত খুবাব বিন্ আল্ আরস কামারের কাজ করতেন। মক্কার কতিপয় মুশরিক তার মুসলমান হওয়ার কারণে তাকে তারই ভাঁটিতে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিল এবং বুকের উপর কেউ বসে পড়লো যাতে তিনি নড়াচড়া না করতে পারেন এমন কি অঙ্গার জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল। দীর্ঘকাল পরে তিনি একবার হযরত উমর (রাঃ)-কে এ ঘটনাটি শুনালেন এবং নিজ পিঠ খুলে দেখালেন, পিঠ জ্বলার দরুন কুষ্ঠ রোগীর মত ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

হযরত আম্মার (রাঃ)-এর মা হযরত সামীয়ার উপর অমানসিকভাবে অত্যাচার করলো পাষণ্ড যালিম আবূ জাহল। সে সামীয়ার পেটে এত জোরে বর্শা মেরে দিল, যে বর্শা পেট ভেদ করে লজ্জাস্থান পর্যন্ত পৌছে গেল। ঐ আঘাতে তিনি ছট্‌ফট করতে করতে মারা গেলেন।

ঐ সকল যালিমদের যুলম ও অত্যাচার সহ্যের বাইরে চলে গেলে একদিন আবদুর রহমান বিন আওফ অন্যান্য সঙ্গীদেরকে নিয়ে হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এখন তো যুলুম ও অত্যাচার চরম সীমায় পৌছে গেছে। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দান করেন যাতে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করতে পারি, তখন নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

"আমাকে না যুদ্ধ করার অনুমতি দান করা হয়েছে, না রক্তপাত করার, আমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তাদের নির্যাতন সহ্য করে তাদের মূর্খতা উপেক্ষা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে" (সীরত ইবনে হিশাম, ৩২০পৃঃ)।

মক্কার মুশরিকদের যুলুম ও নির্যাতনের গণ্ডী দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। তারা মুষ্টিমেয় মুসলমানদের জীবন-যাত্রা দুর্বিষহ করে তুললো। কোন গত্যন্তর না দেখে অবশেষে রজব ৫ই নব্বী সনে এগার জন পুরুষ চারজন মহিলা বাধ্য হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। অবশিষ্ট মুসলমানগণ যুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্য-বস্তুই হয়ে থাকলেন। মুহার্‌রম ৭ নব্বী সনের কথা, মক্কার কুরায়শরা মনস্থ করলো যে, তারা নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামও তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের সঙ্গে বয়কট করবে। সুতরাং পূর্ণ তিন বৎসর পর্যন্ত নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীগণ শেবে আবি তালেবে গৃহবন্দী হয়ে থাকলেন। মক্কার কুরায়শরা ঐ সকল ঘাঁটিতে যেখানে হুযূর আকদস ও সাহাবায়ে কেরাম গৃহবন্দী ছিলেন, সব রকমের খাদ্য ও খাদ্য সামগ্রী যেতে বন্ধ করে দিয়েছি। ক্ষুধার দরুন শিশুদের কান্নাকাটির আওয়াজ ঘাঁটির বাইরেও শুনা যেতো (যাদুল মায়াদ, প্রথম খণ্ড ২৯৯ পৃ.)।

মক্কার অমুসলমান অধিবাসীরা তবলীগের পথে কঠিন বাধা হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এই চিন্তা করে যে, অন্য কোন অঞ্চলে গিয়ে আল্লাহর পয়গাম পৌছালে হয়তো সত্যের সন্ধিৎসু কোন আত্মা সত্য গ্রহণ করতে পারে। তাই তিনি মক্কা থেকে সুদূর তায়েফে গেলেন। সেখানকার অমুসলমান লোকদিগকে তিনি আল্লাহর পয়গাম পেশ করলেন। কিন্তু তায়েফের অধিবাসী বা মক্কার অধিবাসীদের চাইতে বেশী হতভাগ্য প্রমাণিত হলো। তারা কেবল সত্যকে অস্বীকারই করে নি পরন্তু তারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ভীষণ কষ্ট দিল। আর এত নির্যাতন করলো যে, হুযূর আকদস জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহা ভুলতে পারেন নি। ঐ সকল নিষ্ঠুর যালিমদের প্রস্তর নিক্ষেপের ফলে তাঁর পবিত্র দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, দেহ হতে এত রক্তস্রাব

হলো যে, দুর্বলতার দরুন চলতে অক্ষম হয়ে পড়লেন তিনি এবং অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন জ্ঞান ফিরে আসলো তখন তিনি সফরসঙ্গী হযরত যায়দ বিন হারিসকে ভর করে মক্কায় ফিরে আসলেন; কিন্তু বিরোধিতায় মক্কা পূর্বের চাইতে আরও বেশী মেতে উঠলো এবং কঠোর আচরণ প্রকাশ করলো। এই ভাবেই যালিমদের অত্যাচারের ভিতর দিয়ে কিছু দিন অতিবাহিত হলো। কিন্তু তাঁর পক্ষে মক্কায় বাস করা দিন দিন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো এমন কি সেদিনও আসলো যখন মক্কার সকল অমুসলমান গোত্র একত্রে সমবেত হলো এবং দারুন্নাদওয়াতে এই ষড়যন্ত্রকে চূড়ান্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, মুহাম্মদকে (সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম) হত্যা করাই শ্রেয়ঃ হবে। সুতরাং পহেলা রবীউল আওয়াল ১৪ই নব্বী সনের রাতটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। যখন মক্কার সকল অমুসলমান গোত্রের প্রতিনিধিরা খোলা তরবারি নিয়ে পয়গাম্বরে খোদার ঘরকে অবরোধ করে নিল এবং অপেক্ষা করতে থাকলো যে, যখনই হযূর আকদস ঘর থেকে বের হবেন তখনই তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু খোদাতাআলার হিফাযতে হুযূর আকদস তাদের ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং মদীনায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন ভোর হলো, তখন তারা তাঁকে ঘরে না পেয়ে কিছু আঁচ করে আঁ হুযূরের পশ্চাদ্ধাবন করলো। কিন্তু তারা তাদের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হলো।

যখন মক্কার কুরায়শরা জানতে পারলো যে, তিনি মদীনায় চলে গেছেন তখন তারা মদীনাবাসীদের নামে একটি মারাত্মক হুমকিমূলকপত্র পাঠালো যা প্রকারান্তরে খোলা চ্যালেঞ্জ ছিল মদীনা-বাসীদের বিরুদ্ধে এবং চরম শত্রুতার নির্দেশক। সেই পত্রের শব্দগুলি ছিল এইরূপঃ

"নিশ্চয় তোমরা আমাদের এক ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে আশ্রয় দিয়েছো। আমরা খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, হয়তো তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আর না হয় তোমরা তাকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও নচেৎ আমরা আমাদের সমর বাহিনী নিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করবো, তোমাদের পুরুষদিগকে হত্যা করবো, এবং তোমাদের নারীদিগকে আমাদের জন্য বৈধ করে নেবো" (আবূ দাউদ কিতাবুল খিরাজ)।

মক্কার কুরায়শদের এই চিঠি দ্বারা তাদের রক্তপাত করার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে যা হিজরতের পরে তারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের ও ইসলামের বিরুদ্ধে পোষণ করছিল। দেশ ছেড়ে বিদেশে আসার পরও বিরুদ্ধবাদীরা পিছু ছাড়লো না। যখন তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ের যুলুম-অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করে আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সমরবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করার হুমকী দিল তখন হিজরী সনের সফর মাসে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে আত্মরক্ষার অনুমতি দান করলেন এবং এই আয়াত নাযিল করলেন যার অর্থ হলো ঃ

"যাদের বিরুদ্ধে বিনা কারণে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদিগকেও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো কারণ তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে এবং আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাদিগকে তাদের বাড়ীঘর হতে অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, "আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক, আল্লাহ্ যদি এই সকল লোকের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীগণের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যেগুলিতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়া হতো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করেন যারা তাঁর (ধর্মের পথে) সাহায্য করে, নিশ্চয় অতিশয় শক্তিমান মহাপরাক্রমশালী (সূরা আল্ হাজ্জ ঃ ৪০,৪১)।

ইতিহাস সাক্ষী যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে অমুসলিম বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে আত্মরক্ষার্থে পর পর ৭২টি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে মুহার্‌রম মাসে প্রথমবার আত্মরক্ষার জন্য বদরযুদ্ধে নামতে হলো। ৩১৩ জন দুর্বল ও নিরস্ত্র ও সমর কৌশল সম্পর্কে আনাড়ী ও অদক্ষ সাহাবাদিগকে নিয়ে এক হাজার সুদক্ষ ও সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত ঐ সকল যুদ্ধাদের মোকাবেলায় যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে বাধ্য হলেন। যারা এই বলে আক্রমণ করেছিল যে, তারা তরবারির জোরে মুসলমানদের অস্তিত্বকে ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশিহ্ন করে দিবে। অতঃপর বিরুদ্ধবাদী তিন হিজরী সনে দ্বিতীয় সমরাভিযান চালালো এবং মদীনার দ্বারদেশে এসে তাঁবু গাড়লো এবং যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করলো, মুসলমানরা বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করলো। উহুদ যুদ্ধের ময়দানে বিরুদ্ধবাদীরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের এবং সাহাবাদের ক্ষতি সাধন করতে কোন ত্রুটি করে নি। প্রত্যেকটি যুদ্ধেই শত্রুরা যুলুম ও অত্যাচারের জন্য লক্ষ্য-বস্তু স্থির করে নিতো আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামকে। উহুদ যুদ্ধেও শত্রুরা নিজেদের অনিষ্টকারী অপরিত্র হাতে রহমাতুল্লিল আলামীনকে ক্ষত-বিক্ষত করে চিরকালের জন্য নিজেদের নামের উপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করলো যা কেয়ামত পর্যন্ত মু'মিনদের অন্তরকে আঘাত দিতে থাকবে।

অতঃপর হিজরতের পঞ্চম বৎসরের ঘটনা। যখন সকল অমুসলমান বৈরী শক্তিগুলি একতাবদ্ধ হয়ে মদীনা ও মুসলমানদিগকে ঘেরাও ও পরিবেষ্টন করে ফেললো তখন মুসলমানগণ পরিখা খনন করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলো। অমুসলমান বিরুদ্ধবাদী সৈনিকদের সংখ্যা ছিল এবার চব্বিশ হাজার, যারা ভয়াবহ বন্যার ন্যায় মদীনায় আক্রমণ করলো। তাছাড়া চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মদীনার অমুসলমান অধিবাসীরা, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইহুদী, চুক্তি ভঙ্গ করে বৈরী শক্তিসমূহের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। মোট কথা, মদীনার ভিতরের ও বাহিরের অমুসলমান বিরুদ্ধবাদীগণ ইসলামকে নাস্তানাবুদ করার উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ হানলো। আঁ হযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম বার হাজার সৈনিক নিয়ে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করলেন।

এইরূপে হিজরতের চতুর্থ বৎসরের ঘটনা, যখন আরবের দুইটি অমুসলিম গোত্র আযল ও কারাহ নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট দরখাস্ত করে দশজন মুসলমান মুবাল্লেগকে নিজেদের অঞ্চলে ডেকে এনে নির্দয় ও নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেলে। ঐ সময়েরই আর একটি ঘটনা নজদ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক অমুসলমান নবী করীম সলাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে দরখাস্ত পেশ করলো যে, কিছু সংখ্যক ইসলামের মুবাল্লেগ তাদের অঞ্চলে পাঠানো হোক যেন সেখানকার লোককে

ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করলেন, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে, কিন্তু আবুল বরা নামে জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির দরখাস্তে যে, "আমি তাদের জামিন হলাম, নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম (৭০) সত্তর জন মুসলমানকে, যারা সকলেই কুরআনের হাফেয ছিলেন তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু হায় আফসোস! এই যুলুম ও নির্যাতনের জন্য অশেষ পরিতাপ!! এই সত্তর জনের সঙ্গেও সেই নৃশংস ব্যবহার করা হলো যা পূর্বে দশ জন মুবাল্লেগের সাথে করা হয়েছিল।

মোট কথা, এমন কোন যুলুম ও অন্যায় ছিল না যা মানুষ মানুষের উপর করতে পারে আর গোটা আরবের বৈরী শক্তিগুলি এক জোট হয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর করে নি।

সুধী শ্রোতাবৃন্দ, এই তো হলো ছবির একটি সংক্ষিপ্ত দিক যা আপনারা শুনলেন। আসুন এখন আপনাদের মনোযোগ এই মহান ব্যক্তির রহমাতুল্লিল আলামীন হওয়ার অপূর্ব ও উজ্জ্বল দিকটির প্রতি নিবদ্ধ করি যা তিনি তাঁর ঘোর অমুসলিম শত্রুদের জন্য প্রদর্শন করেছেন।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আলোতে আঁ হযরত (সঃ)-এর ব্যবহার ঃ

ধর্মের ও বিবেকের স্বাধীনতার অভাবের ফলে যা আপনারা ইতোপূর্বে কিছু লক্ষ্য করেছেন, মক্কার সকল মুশরিক এবং সকল অমুসলিম বৈরী শক্তিগুলি নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা কেরাম (রাঃ)-কে শুধু এই কারণে যে, তারা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান এনেছিল, অমানসিকভাবে অত্যাচার, যুলুম ও নির্যাতন করেছিল। ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ব্যাপারে তারা কোন ত্রুটি করেনি। তারা ইসলামের মুবাল্লেগদিগকে ধোঁকা দিয়ে ডেকে এনে হত্যা করেছে, তারা দুর্বল ও নিষ্পাপ স্বাধীন মুসলমানদিগকে নিজেদের নিকট দাসের ন্যায় বন্দী করে রেখেছে। তারা সাহাবাদের পবিত্রা সতী-স্বাধী মহিলাদিগকে নিজের দাসী করার ষড়যন্ত্র করেছে। তাদের বিরুদ্ধে পরপর যুদ্ধ করেছে, তাদের সম্মানীত শহীদদের নাক,কান, চোখ, হাত-পা বিপরীত দিক থেকে এক একটি করে কেটে লাশকে বিভীষিকাময় করে তুলেছে। তাদের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের উপর পৈশাচিক ও নির্লজ্জভাবে আক্রমণ করে তাদের গর্ভের সন্তান নষ্ট করেছে। তাদের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের লজ্জা স্থানে বল্লম মেরে মেরে তাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

সুধী ভ্রাতৃমন্ডলী! এইসব কিছু অমুসলমান বিরুদ্ধবাদীদের তরফ থেকে তখন করা হয়েছে যখন তারা একচেটিয়াভাবে ক্ষমতায় ছিল, শক্তির অধিকারী ছিল এবং হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা কেরাম পরম নিঃসঙ্গ ও নিরুপায় অবস্থায় যুলুম ও অত্যাচারের চাকায় নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন। কিন্তু পরম শক্তি ও সম্মানের অধিপতি আল্লাহ্ তাঁর নবী সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে যখন তাদের উপর জয় ও ক্ষমতা দান করলেন তখন সকলের দৃষ্টি তাঁর উপর নিবদ্ধ ছিল যে, আজ যালিমদিগকে হাঁ, ঐ সকল যালিমদিগকে যাদের দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না, তাদের যুলুমের শাস্তি এখন ভুগতে হবে।

আঁ হযরতের হাতে মক্কা জয় হয়ে গিয়েছিল। তিনি বিজয়ী বেশে উপস্থিত আছেন আর তাঁর সামনে রয়েছে ঐ সকল লোক যেন কল্পনার জগতে হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহোতাআলা আনহো তাঁকে বলছিলেন যে, হে মক্কার বিজয়ী! এই সকল লোকের মধ্যে তারাও রয়েছে যারা আমার লাশকে কেটে ছিঁড়ে বিভীষিকাময় করেছিল এবং আমার যকৃৎ ও কলিজা বের করে ফেলেছিল। তাঁর কন্যা হযরত যয়নব তাঁকে সম্বোধন করে বলছিলেন, হে আব্বাজান! এই সকল লোকই তারা যারা একজন মহিলার উপর হাত উঠাতে গিয়ে একটুও লজ্জা বোধ করেনি, আমার উপর এমন অবস্থায় আক্রমণ করেছে যখন আমি গর্ভবতী ছিলাম এবং এদের যুলুম ও অত্যাচারের ফলে আমার মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর উপর প্রাণ বিসর্জনকারী সাহাবাগণ যাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের আত্মাগুলি রহমতুল্লিল আলামীনের সমীপে দাঁড়িয়ে নিজেদের নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়ার হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন, এ সকল লোকই আমাদের হত্যাকারী, এখন এদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কিন্তু এইরূপ উত্তপ্ত আবেগ সত্ত্বেও আঁহযরত সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর অমুসলিম বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন! এই প্রসঙ্গে যদি আমি স্বয়ং কিছু বলি তা হলে ধারণা করা যেতে পারে যে, ইহা তো নিজ তরফ থেকে প্রশংসা, তাই আমি একজন অমুসলিম ইহুদী পণ্ডিতের সাক্ষ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। জনাব ষ্টেনলি লেইন পোল "কুরআন চয়নিকা" এর ভূমিকার ৬৭ পৃষ্ঠায় মক্কা বিজয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

"এই সময় সুযোগ ছিল যে, পয়গাম্বর (সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম) রক্ত পিপাসু প্রকৃতির পরিচয় দিতেন। তাঁর অনেক পুরানো নির্যাতনকারী ও অত্যাচারকারীরা তাঁর পদতলে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় ছিল। তিনি কি ঐ সময় পাষণ্ড ও নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে তাদিগকে নিষ্পেষিত করে দিবেন। কঠিন শাস্তিতে গেরেফতার করবেন, তাদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন?

এই মুহূর্ত তাঁর প্রকৃত প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রকাশের সময়। এই সময় আমরা এমন সব অত্যাচার সংঘটিত হওয়ার প্রত্যাশায় আছি যা শুনলে আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠতে পারে; যেগুলির কল্পনা করে যদি আমরা পূর্বেই ঘৃণা ও তিরস্কারের শোরগোল আরম্ভ করি তাহলে এইরূপ করাটা অবশ্য যথার্থই হবে। কিন্তু বিষয়টি কী হলো? কী বাজারে কোন রক্তপাত হয় নাই? সহস্র সহস্র নিহত লোকের লাশ কোথায় গেল? অনেক ঘটনা এমন সময় অবশ্য কঠোর এবং নির্দয় ও নিষ্ঠুর হৃদয়বিদারক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা এই যে, যেদিন পয়গাম্বর (সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম) তাঁর শত্রুদের উপর মহা বিজয় লাভ করেছিলেন সেই দিনটি তাঁর জন্য নিজের আত্মার উপর সবচাইতে বড় বিজয় অর্জন করার দিনও ছিল বটে। কুরায়শরা বৎসরের পর বৎসর ধরে তাঁকে যেসব দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিল, নিষ্ঠুর ও লাঞ্ছনা এবং অপমানজনক বিপদ-আপদ তাঁর উপর এনেছিল, তিনি মুক্ত মনে ঐ সব কথা উপেক্ষা করে গেলেন এবং মক্কার সকল অধিবাসীদিগকে এক সর্বব্যাপী সাধারণ

ক্ষমার ঘোষণা প্রদান করলেন।"

সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী! ইহা একটি সংক্ষিপ্ত ঝলক মাত্র ঐ ঘটনার যা ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মক্কার কুরায়শগণের তরফ থেকে আরবের ভূমিতে সংঘটিত হয়েছিল। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, সকল ধর্মের অনুসারীরাই কীভাবে ঐ সকল লোকের উপর যুলুম অত্যাচার করেছে যারা তাদের জন্মগত অধিকারকে এই বলে ব্যবহার করেছিল যে, আল্লাহ্ আমাদের রব্ব্ ও প্রভু। অতঃপর আপনারা ইহার মোকাবেলায় ইহাও লক্ষ্য করেছেন যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সায়্যেদনা হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই কীরূপে তাদের জঘন্য যুলুম অত্যাচারকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দিলেন। তদুপরি তাদিগকে তিনি তাঁর উত্তম তা'লীম এবং উত্তম আদর্শ দ্বারা তাদের জন্য বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

রহমতুল্লিল আলামীন অমুসলিম বিরুদ্ধবাদীদের অনুভূতি ও আবেগ এবং মনোভাবের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল রেখেছেন, তাদের মনোতুষ্টি ও মনোস্বস্তির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছেন এবং উহার উপর আমল করে এমন উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থাপন করেছেন যা কেয়ামত অবধি মানুষের জীবন যাত্রার তিমিরাচ্ছন্ন পথে উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় পথ পদর্শন করতে থাকবে, যা একদিকে তার পার্থিক জীবনকে আল্লাহ্র দৃষ্টিতেও এবং তাঁর মখলুকের দৃষ্টিতেও সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারে এবং অপরদিকে পরজীবনে তার জন্য পাথেয় হতে পারে। আল্লাহ্তাআলা ইরশাদ করেছেন:

"তোমরা যারা আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি এবং পরকালের উত্তম পুরস্কারের কামনা কর তোমরা আল্লাহ্র রসূলের 'উৎকৃষ্ট' আদর্শকে জীবন যাত্রার পথে প্রদীপস্বরূপ ধারণ কর।"(সূরা আহযাব : ২২ আয়াত)

সুতরাং নবী আকরম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয় সাল্লাম অমুসলিম বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে ধর্মের ক্ষেত্রে যে পরমত সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়েছেন, যাকে আল্লাহ্তাআলা 'উৎকৃষ্ট' এবং গ্রহণীয়, বরণীয় ও অনুকরণীয় বলে আখ্যা দিয়েছেন, উহা সবিস্তারে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বর্ণনা করা শুধু মুশ্কিলই নয় অসম্ভবও বটে। তাই অতি সংক্ষেপে কয়েকটি দিক নিয়ে আলোকপাত করবো।

অভিজ্ঞতার আলোতে ইহা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ধর্মকে তার অতি প্রিয় ও পসন্দনীয় বস্তু বলে জ্ঞান করে যদিও উহাতে অন্যের দৃষ্টিতে কিছু দুর্বল এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি নিহিত থাকুক না কেন। এমন ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মুহাম্মদ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে সম্বোধন করে অমুসলিম বিরুদ্ধবাদীদের অনুভূতি ও আবেগের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষ তাগিদপূর্ণ আদেশ দান করেছেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্তাআলার হুকুম তাহাদিগকে শুনিয়েছেন।

"তোমরা তাদেরকে গালি দিও না যাদেরকে তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে (মা'বূদরূপে) ডাকে; নতুবা তারা শত্রুতাবশত: অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্কে গালি দিবে" (সূরা আনআম : ১০৯ আয়াত)।

এই শিক্ষার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, হে মুসলমানগণ! অবশ্য দুনিয়াতে এমন লোকও মজুদ আছে যারা এক-অদ্বিতীয় খোদাকে ছেড়ে অন্য অস্তিত্বকে নিজেদের মা'বূদ বলে মানে; তাদের দৃষ্টিতে তারাই শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন, তাই তোমাদের একান্ত কর্তব্য হবে, যখন তোমরা তাদের মা'বূদদের উল্লেখ করবে তখন তোমরা তাদের মা'বূদকে অবজ্ঞাভরে উল্লেখ করবে না ; নচেৎ তারাও তোমাদের প্রকৃত মা'বূদ আল্লাহ্কে গালমন্দ দিবে এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে। (অসমাপ্ত)

অনুবাদক : **আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক,**
সদর মুরব্বী

ধর্ম কি ও কেন

একটি প্রশ্ন প্রায়শঃ মনে উদিত হয়। ধর্ম কি মানুষের জন্য নাকি মানুষই ধর্মের জন্য। যেহেতু ধর্ম মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে একটি যোগসূত্র। সেই হেতু ধর্ম মানব জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা ভাষায় 'ধর্ম' শব্দটি 'ধৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হোল ধারণ অর্থাৎ আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে ধারণ – আর তা হোল আল্লাহ্র তৌহীদের উপর বিশ্বাস ও আমল; যাকে দীন বা ধর্ম বলা হয়। যেমন কুরআন পাকে আল্লাহ্ বলেছেন, – এবং তাহাদিগকে ইহা ব্যতিরেকে আদেশ দেওয়া হয় নাই যে, তাহারা কেবল আল্লাহ্রই ইবাদত করিবে, 'ধর্মকে' তাহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া একনিষ্ঠভাবে, এবং নামায কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে এবং ইহাই (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্ম" *(সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্ আয়াত -৬)*।

অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে তাঁর প্রভুত্ব সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, "এবং আল্লাহ্কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর, তিনি তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী *(সূরা আল্ হাজ্জ, আয়াত-৭৯)*।

আল্লাহ্তাআলা মানুষের এত নিকটের এবং এত আপন যা কল্পনার অতীত। তাই প্রতিটি মানুষের তার স্রষ্টার প্রতি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে যা কখনই ভুলে গেলে চলবে না। স্রষ্টার রহমানীয়ত ও রহীমিয়তের কারণে মানুষকে তাঁর রুকূকারী, সেজদাকারী ও ইবাদতকারী ও পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী হতে হয় – যা তাকে পরিপূর্ণ সফলতা এনে দেবে এবং স্রষ্টার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়।

সময়ের ব্যবধানে জগতে বহু ধর্মের উদ্ভব হয়েছে – আর সব ধর্মের নীতিমালাগুলোর সাথে পরস্পর মিল খুঁজে পাওয়া যায়, স্রষ্টার সকল আদেশ-নিষেধ মান্য করাও প্রতিটি ধর্মের একটি কর্ম-প্রক্রিয়া। জগতে সমস্ত নবী একই ধর্ম নিয়ে আগমন করেন, যেমন, আল্লাহ্ বলেন এবং তোমাদের এই জামাত বস্তুত: একই জামাত এবং আমি তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা আমার তাকওয়া অবলম্বন কর" *(সূরা আল্ মু'মিনূন : আয়াত –৫৩)*।

ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানব জীবনের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও স্থান-কাল-পাত্র ও সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন ধর্মে নবীগণ সুস্থ মানুষ গড়তে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন। তারাই সুস্থ মানুষ যারা স্রষ্টার কথা মান্য করে

এবং তাঁর ইবাদত করে ও তাঁকে স্মরণ করে – এবং তাঁকে পেয়ে মুক্তিলাভে সক্ষম হতে প্রয়াস পায়। সেজন্য রসূল করীম (সঃ) বলেছেন – যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সে আল্লাহ্‌কে পায়। তাই আল্লাহ্ বলেন – 'সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, এবং অকৃতজ্ঞ হইও না।" *(বাকারা আয়াত – ১৫৩)* হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ্ বলেছেন, – যে তাঁর দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আল্লাহ্ তার দিকে দুই হাত এগিয়ে আসেন। যে আল্লাহ্‌র দিকে হেঁটে আসে, আল্লাহ্ তাঁর দিকে দৌড়িয়ে আসেন। সুতরাং দেখা যায় আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কল্যণকামিতায় মহত্ত্বের অধিকারী। যুগে যুগে ধর্ম মানুষকে বিবেকবান করে, সৎ করে এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের তাগিদ দেয়; – এবং মানব মুক্তির পথ বাত্‌লে দেয়। – এপথে মন্দ সদাই পরিত্যজ্য। এবং ন্যায়-নীতি, সৎ জীবন একান্তভাবে গ্রহণীয়, যদিও সংঘাতময় হয়।

জগতে যুগে যুগে বহু ধর্ম প্রবর্তকের আগমনের পর ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের আগমন ঘটে। যদিও প্রত্যেকেই একই ধর্ম প্রচার করেন (তৌহীদ)। কিন্তু পরবর্তীতে নবীর অনুসারীরা তা বিকৃত করে বিভিন্ন নাম দেয় এবং শিশু জন্ম-সূত্রে পিতামাতার ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন – এক, মানবজাতিএকই উম্মতভুক্ত ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ করিল।"

ইসলাম স্রষ্টা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই ইসলাম। এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মানুষ স্রষ্টার নিকটে পৌঁছাতে প্রয়াস পায়। এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করে থাকে। কেবল ধর্মপরায়ণ মানুষেরাই স্রষ্টার নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হয়। এবং তারা মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয় না। ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে শান্তির সাদর সম্ভাষণ দ্বারা আমন্ত্রণ জানান হবে। 'সালামুন ক্বওলাম মির্ রব্বির রহীম – তাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের এই উক্তিই এর সাক্ষ্য। যেহেতু ইসলাম শান্তির ধর্ম তাই সেখানে কোন কলহ্-ফাসাদ বা অশান্তির ছোঁয়া থাকবে না। সেখানে একের সাথে অন্যের সাক্ষাতে পরস্পরের বিনিময় হয় –'আস্‌সালামু আলায়কুম' অর্থাৎ আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। কতবড় ঔদার্য ইসলাম দেখিয়েছে। সকল ধর্মের মৌলিক তত্ত্বের মিল থাকা সত্ত্বেও ইসলামে ধর্মের পুর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিভিন্ন ধর্মের নবীগণ এসেছিলেন বিশেষ কোন জাতিতে বিশেষ কোন স্থানে ধর্মের প্রচারক হিসাবে মানুষকে সঠিক পথের ঠিকানা জানাবার কাজে। কিন্তু ইসলাম এসেছে সত্যের ঠিকানা নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে – বিশ্বধর্ম হিসাবে। যে ধর্ম পালনে মানব জীবনের লক্ষ্য-বস্তু অর্জন সম্ভব হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে ভিন্ন আচার ব্যবহার ও সংস্কৃতির কারণে গরমিল হয়ে থাকে। আবার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝেও অনেক ক্ষেত্রেই দাংগা মারামারি বা কলহ-ফাসাদের উদ্ভব হয়, কিন্তু কোন ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এটা নয়; বরং সকল ধর্মই হিংস্রতা নৃশংসতা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে শুধু ভিন্নমতাবলম্বীদের মাঝেই যে সহিংসতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এমন নয়; – একই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও এর অভাব নেই। এক কথায় মানুষ যেন সহিংসতায় মেতে উঠেছে, কেউ আবার এমন ধুঁয়া তোলে – ধর্মের নামে রক্তপাত জায়েয এই উচ্চারিত বাক্যে মহান স্রষ্টার অপমান ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে বলেছেন 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন – ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই (বাকারা)। ধর্মের নামে রক্তপাত – অধর্মেরই নামান্তর। কারণ যা কিছু ভাল সৎ ও সহজ তা-ই তো ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। মানুষে মানুষে সহৃদ্যতা সহমর্মিতা ধর্মেরই অঙ্গ। আজ কিন্তু এ কথাটি মানুষের নিকটে প্রায় ভ্রান্ত ধারণা বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

জগতে দার্শনিকের অভাব নেই, অভাব নেই তর্কের বা যুক্তির। স্রষ্টার অস্তিত্বেও তাদের মনে সন্দেহের উদয় হয়ে থাকে, যা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। ঐ সব মানুষের জন্য – যাদের বিশ্বাসে ভেজাল মিশ্রিত আছে। কিন্তু অবশেষে সব যুক্তি ও তর্কের অবসান ঘটে থাকে। যেহেতু সকল যুক্তি খণ্ডনের ভার ন্যস্ত রয়েছে সেই বিরাট সত্তার উপর, যাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তির শেষ নেই। আমরা দেখতে পাই যে, কোন একটি কাজ ঘটার পেছনে একটি কারণ অবশ্যম্ভাবীরূপে থাকতেই হবে। যেমন প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়, একটি বীজ দেয় অঙ্কুর – অঙ্কুর দেয় গাছ, যা অনেক সময়ে মহীরূহেও পরিণত হতে পারে। কিন্তু শুষ্ক ভূমি সঞ্জীবিত হয়ে না উঠলে তা সম্ভব নয়। স্রষ্টার বারিবর্ষণ ভূমিকে করে তোলে সঞ্জীবিত আর তাতেই এটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। নবীর আগমনের সময় আল্লাহ্‌র ঐশী-বাণীরূপ বারি মানবরূপ যমীনকে সিঞ্চিত করে, এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণের পর যুগের নবীকে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে দীন-দুনিয়ার মালিকের উপর। এই বিশ্বাসক্রমে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে পূর্ণ একীনের পর্যায়ে পৌঁছে খোদার সীমাহীন প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে খোদা প্রাপ্তি ঘটায়। এবং যে প্রক্রিয়া খোদা-প্রাপ্তি ঘটায় তাই ধর্ম। ধর্মই মানুষকে খোদার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়।

স্রষ্টা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। ধর্ম মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। মানুষকে যেমন সত্যিকার অর্থে মানুষ হতে হলে মানবীয়গুণাবলীতে ভূষিত হতে হয়, তেমনি ধার্মিক হতে হলেও মানুষকে আগে সত্যিকার অর্থে মানুষ হতে হবে – নইলে সে কখনই ধার্মিক হতে পারবে না। কারণ ধার্মিক সেই ব্যক্তি, যে সবকিছুর উর্ধ্বে খোদাকে স্থান দিয়ে থাকে এবং আপন সত্তা বলে তার কিছুই থাকে না। খোদার পথেই নিজেকে আত্মোৎসর্গীত করে পরিপূর্ণভাবে। সকল অন্যায় অশুভ ও মন্দ থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং সহজ-সরল সৎ জীবন যাপন তার কাম্য হয়; এবং সে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনকেই তার জীবনের ব্রত বলে মনে করে। এ জন্যই আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বলেছেন, – "আদেশ দিবার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্; তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া কোন কিছুরই ইবাদত করবে না। ইহাই সঠিক ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না" *(সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪১)*।

যেহেতু আল্লাহ্ মানুষের হেদায়াতের জন্য ধর্ম নাযেল করেছেন, যেহেতু মানুষের উচিত যেন সে ধর্মকে সত্যিকার অর্থে পালন করে এবং খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হিসাবে মৃত্যু বরণ করে; যা তাঁর চরম ও পরম লক্ষ্য। তারাই সেই ব্যক্তি যাঁরা বলেন, "ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্‌ইয়্যায়া ওয়ামামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামীন, লা শারীকালাহু, ওয়া বেযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন।"

নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম *(সূরা আন্‌আম : আয়াত – ১৬৩-১৬৪)*।

আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য এমন বাগানসমূহ প্রস্তুত করেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, এবং তথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই পরম সফলতা।

কতই না উত্তম হত যদি সকলেই ধর্মের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে শুধু ধর্মের বাহ্যিকতা তথা আনুষ্ঠানিকতার মাঝে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ না রেখে তার অভ্যন্তরীণ তত্ত্ব বা সারকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে নিজেদের পরিচালিত করত!

–রওশন আরা হক

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ চরিত্রের কতিপয় দিক

"লাকাদ কানা লাকুম ফি রসূলিল্লাহে উসওয়াতুন হাসানাহ্" অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। মানব দরদী মহানবী (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক আমাদের জানা দরকার এবং সেগুলো কমবেশী নিজেদের জীবনে আমল করতে পারলে ইনশাআল্লাহ্ অনেকখানি সফলতা অর্জন করা সম্ভব। ভণ্ড-প্রতারকের বাহ্যিক বাক্যে এবং স্বগৃহে স্বীয় কার্যে অনেক অসামঞ্জস্য দেখা যায়। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে এরূপ চিন্তা কল্পনায়ই আসে না। তাঁর (সঃ) আদর্শ চরিত্রের স্মরণীয় ও অনুকরণীয় কতিপয় দিক এখানে উপস্থাপন করা গেল :

১) ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া বর্জন :

এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী, আখেরাত চিরস্থায়ী। আখেরাতের স্থায়ী কল্যাণের জন্য তিনি (সঃ) পার্থিব লোভ-লালসা বর্জন করেছেন। পার্থিব রাজা-বাদশাহ্‌র মতো তিনি (সঃ) অর্থের পাহাড় নামে-বেনামে গড়ে তুলেন নি। সারা আরব জাহানের নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি দীনহীন ভিখারীর ন্যায় সরল-সাদাসিদে জীবন অতিবাহিত করেছেন। জনগণের সম্পদ তিনি (সঃ) এক রাতের জন্যও নিজের কাছে রাখেন নি। কোন এক সময় ফিদাকের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ৪টি উটে করে খাদ্য শস্য তাঁর (সঃ) কাছে প্রেরণ করলে মহানবী (সঃ) তা জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দেন। বাহরাইন থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ সম্পদ মসজিদের প্রান্তরে একত্রিত করে হিস্যা অনুযায়ী সাধারণের মধ্যে বন্টন করে দেন। মহানবী (সঃ) কখনো সদকা ও ইহসান গ্রহণ করতেন না। এগুলো তিনি নিজের এবং তাঁর বংশধরদের জন্য নিষিদ্ধ মনে করতেন। যেমন সদকার একটি খেজুর মহানবী (সঃ)-এর নাতী হযরত হাসান মুখে দিলে তিনি (সঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ থেকে তা বের করে দেন।

২) মজলিসে নবী করীম (সঃ)-এর আদর্শ :

তাঁর (সঃ) সম্মানে মজলিসে লোকজন দাঁড়ালে তিনি তা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন "ইহা ইরানী পদ্ধতি। আমি কোন বাদশাহ্ নই। আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ, খোদাতাআলা আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন।" মজলিসে তিনি (সঃ) ধীর-স্থির, পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি (সঃ) কখনো অট্টহাসি করতেন না। ছোট বড় সকলকে তিনি (সঃ) দেখা মাত্রই আগে 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলে সম্ভাষণ করতেন। বক্তৃতার সময় সবার মুখে তাকিয়ে বলতেন। অধিক গুরুত্বপুর্ণ কথা সাধারণতঃ তিনবার বলতেন। কোন লোক বা সম্প্রদায় তাঁর (সঃ) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসলে মর্যাদা অনুযায়ী ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। আগন্তুকের কুশল প্রথমে করতেন। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। কোন মজলিসে তশরীফ নিলে তিনি (সঃ) তিনবার সালাম করতেন: ক) প্রবেশ অনুমতি খ) সাক্ষাৎ সময় ও গ) বিদায়কালীন সময়।

(৩) ন্যায়-বিচারের অনন্য দৃষ্টান্ত :

পার্থিব রাজা-বাদশাহ্, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, দলীয় নেতা-উপনেতা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন বা দলীয় কর্মীদেরকে আইনের উর্ধ্বে মনে করে থাকেন; এমনকি তাঁদের প্রয়োজনে দেশের আইন সংশোধন করে থাকেন। কিন্তু মহানবী (সঃ) সর্বদা ন্যায়-বিচারের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতেন না; যেমন– ক) তাঁর (সঃ) একমাত্র জীবিত কন্যা হযরত ফাতেমাকে একটি কাজের মেয়ে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

খ) বদরের যুদ্ধে তাঁর (সঃ) আপন চাচা হযরত আব্বাস বন্দী শিবিরে দড়ির বাঁধনে গোঙরাতে ছিলেন তখন মহানবী (সঃ) তাঁর শয্যায় এপাশ-ওপাশ করছিলেন, কিন্তু আব্বাসের প্রতি একটু সহনশীল হওয়ার জন্য মুখ থেকে কোন বাক্য উচ্চারণ করেন নি। সাহাবীগণ নিজেরা আব্বাসের বাঁধন ঢিল করে দিলে তিনি ঘুমিয়ে যান। আব্বাসের গোঙরানি শুনতে না পেয়ে তিনি (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন–"আব্বাস কি শেষ হয়ে গেলো?" সাহাবীরা উত্তর দিলেন, "তাঁর বাঁধন ঢিলা করা হয়েছে।" এতে নবী করীম (সঃ) বলে উঠলেন, "না না, এতে অবিচার হতে পারে। আব্বাস আমার আত্মীয় অন্যান্যরা অপর লোকদের আত্মীয়। অন্যান্য বন্দীদের বাঁধন ঢিলা করে দাও নচেৎ আব্বাসের বাঁধন শক্ত করে দাও।"

৪) বন্দীদের মুক্তির বেলায় ন্যায়-বিচার :

বন্দী-মুক্তির বেলায় সে সময় ৩টি শর্ত ছিল :

ক) অধিকাংশ অশিক্ষিত গরীব বন্দীদেরকে প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো,

খ) শিক্ষিত গরীব বন্দীদেরকে ১টি করে মুসলমান ছেলেকে লিখন ও পঠন শিখাতে হতো,

গ) অন্যদেরকে ফিদিয়া (মুক্তি-পণ) দিতে হতো।

বদরের যুদ্ধে হযরত (সঃ)-এর চাচা আব্বাসের পক্ষে মদীনার তাঁর আত্মীয়-স্বজন ফিদিয়া ছাড়া মুক্তি করার সুপারিশ করলেন এবং আব্বাস নিজেও দীনতা প্রকাশ করলেন, মহানবী (সঃ) তৎক্ষণাৎ আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে চাচা! আপনি যে স্বর্ণ গৃহে পুঁতে রেখে এসেছেন উহার কি হলো?" এইভাবে মুক্তি-পণ আদায় করে নিজ চাচা আব্বাসকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মহানবী (সঃ)-এর আপন জামাতা যয়নাবের স্বামী আবুল আসও একই যুদ্ধে বন্দী হলে লোক মারফত যয়নাবের গলার হার মক্কা থেকে এনে জনগণের কোষাগারে জমা করে আবুল আস মুক্তি পান। উল্লেখ্য, হারটি হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রিয় সহধর্মিণী হযরত খদীজার (রাঃ) ছিল। যয়নাবের বিবাহের সময় তাকে ইহা উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল।

উইলিয়াম মূর যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে লিখতে বাধ্য হন, "মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ অনুসারে মদীনার আনসার ও মুহাজির যুদ্ধ-বন্দীগণকে আপন আপন গৃহে স্থান দিলেন এবং তাদের প্রতি উদার ব্যবহার করতে লাগলেন।"

বদরের যুদ্ধে অন্যতম বন্দী সুহায়েল বিন আমর খুবই দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলো। এই ব্যক্তি ইসলাম এবং তার প্রিয় রসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বেড়াতো। হযরত উমর এই নরাধমের দাঁত উপড়ানোর প্রস্তাব দিলে মহানবী (সঃ) প্রতিবাদ করে বলেন, "যদিও আমি নবী, ব্যক্তিগতভাবে তার কোন অঙ্গ নষ্ট করলে পরকালে এর জন্য দায়ী হব।" অন্যান্য বন্দীদের বিচার প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) হযরত উমর ও হযরত আবূ বকরের মতামত চাইলেন। হযরত উমর প্রস্তাব দিলেন, "শত্রুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই; তাদের হত্যা করা হোক।" অপরপক্ষে হযরত আবূ বকর প্রস্তাব রাখেন, "বন্দীগণ সকলেই আমার স্বজন। তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হোক।" রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আবূ বকরের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

বদরের যুদ্ধে আবূ জাহল সহ ৭০ জন কোরেশ নেতা নিহত হলে এদের সকলকে এক সঙ্গে একই গর্তে পুঁতে দেয়া হয়। মহানবী (সঃ) ঐ গর্তের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেন, "তোমরা আমার নিজের লোক! তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিলে; কিন্তু অপরেরা আমার প্রতি বিশ্বাসী হইল; তোমরা আমাকে জন্মভূমি হইতে তাড়াইয়া দিলে! কিন্তু

বিদেশীরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করিল! ওহো! আজ তোমাদের কি পরিণাম হইল?"

৫) যুদ্ধের লাশের সঙ্গে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত :
ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সঃ)-এর আপন চাচা হযরত হামযার দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে তাঁর কলিজা চর্বণ করা হয়। নাক ও কান কেটে মালা প্রস্তুত করে আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা নিজ গলায় পরে। হযরত আনাস বিন নজরের দেহকে ৭০ (সত্তর) টুকরা করা হয় এবং অন্যান্য মুসলিম সেনার নাক ও কান কেটে রমণীগণ যথাসাধ্য লাঞ্ছনা করে।
অপরপক্ষে খন্দকের যুদ্ধে নিহত কোরেশ নেতা নওফেলের লাশের সঙ্গে মুসলমানগণ তেমন ব্যবহার করেন নি। তথাপি কোরেশগণ মনে করেছিল হয়তো বা মুহাম্মদ (সঃ) ওহুদের যুদ্ধের বদলা নিবেন। তাই তারা ১০ (দশ) হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে লাশ ফেরৎ চাইলেন। প্রস্তাবের উত্তরে মানবদরদী রহমাতুল্লিল আলামীন নবী করীম (সঃ) উত্তর দিলেন, "এ লাশ নিয়ে আমরা কী করব? এ লাশ আমাদের কোন কাজে আসবে না যেজন্য তোমাদের কাছে এর মূল্য গ্রহণ করব?"

৬) তৌহীদের বিষয়ে আপোষহীনতা :
মহানবী (সাঃ) তৌহীদের বিষয়ে কখনও জীবনে কারো সঙ্গে আপোষ করতেন না। ওহুদের যুদ্ধের ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটলে মুহাম্মদ (সঃ) এর দন্ত মোবারক শহীদ হলে চারিদিকে রটে যায় যে, মুহাম্মদ (সঃ) নিহত হয়েছেন। এ সুযোগে আবূ সুফিয়ান তার দলবলকে উল্লাসের সুরে শ্লোগান দিতে বলে, "আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করেছি।" হুযূর পাক (সঃ)-এর উত্তর দিতে নিষেধ করলেন। এরপর কাফেরগণ বলতে লাগল, "আমরা আবূ বকরকে হত্যা করেছি; আমরা উমরকে হত্যা করেছি।" প্রতি ক্ষেত্রে মুসলমানকে নীরব থাকতে বলা হলো। যখন কাফের বাহিনী "জয় হুবলের! জয় হুবলের শ্লোগান দিল" হযরত নবী করীম (সঃ) তখন আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি (সঃ) তৎক্ষণাৎ সকলকে 'নারায়ে তকবীর ধ্বনি লাগাতে বললেন, "আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্রই জয়)।"

৭) সাম্যবাদের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত :
মহানবী (সঃ) কোন এক সময়ে তাঁর কতিপয় সাহাবী নিয়ে প্রবাসে ছিলেন। রাতে শিবিরে রান্নার সময় হলে উপস্থিত সাহাবীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ভাগ করে নিলে মহানবী (সঃ) বললেন, "আমাকে কী কাজ দিলে?" সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, "হুযূর, আপনি আল্লাহ্র রসূল, জগতের গুরু এবং আমাদের মাথার মণি। আপনাকে কোন কাজ করতে হবে না।" এতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, "কোন ব্যক্তি নিজেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করে বন্ধুদের মধ্যে বসে থাকুক; ইহা আল্লাহ্ মোটেই পসন্দ করেন না। আমি চললাম কাঠ সংগ্রহের জন্য।" সাম্যবাদের ইহা এক নযীরবিহীন উদাহরণ! আল্লাহ্র নবী (সঃ) সবচে' কঠিন, কষ্টকর ও নিম্নমানের কাজ করতে গেলেন।

৮) কৃতজ্ঞতার অনুভূতি :
আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যে কৃতজ্ঞতার অনভূতি একান্ত প্রবল ছিলো, "তাঈ কবিলা"র যুদ্ধ-বন্দীদের সঙ্গে দানবীর হাতেম তাঈ'এর কন্যাও ছিলেন। নবী করীম (সঃ) তাকে লক্ষ্য করে সাহাবীগণকে বললেন, "তার পিতা অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি জনগণের সাথে বড়ই সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এ কারণে তাঁর কন্যা এবং ঐ কবিলার (গোত্র) লোকদের বন্দী করা যায় না।" তিনি (সঃ) তাঈ কবিলাকে ক্ষমা করে দিলেন।

৯) খেদমতে খালকের অনন্য দৃষ্টান্ত :
একবার এক বুড়ি মক্কায় বাস করার জন্য আসে। সে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শত্রুদের মিথ্যা প্রচারিত সংবাদে প্রভাবিত হয়ে মক্কা ছেড়ে বাইরে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই বৃদ্ধা মনে করে মুহাম্মদের যাদুর কবলে পড়ে তারও ঈমান চলে যাবে। তাই তড়িঘড়ি করে মক্কা ছেড়ে চলে যাবার পথে মুহাম্মদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। বুড়ি তাঁকে চিনতে পারে নি। হযরত নবী করীম (সঃ) তার মাথার বোঝা নিজ মাথায় নিয়ে বুড়ির বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। বুড়ি তাঁকে কিছু বকশিশ দিতে চাইলে তিনি (সঃ) তা নিতে অস্বীকার করেন। বুড়ি তাঁর নাম জানতে পেরে বলতে থাকে, "এতদিন যার কথা শুনছিলাম যে, তার কাছে যাদু আছে এই সেই মুহাম্মদ!"
বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর (সঃ) প্রতি ঈমান আনলেন। খেদমতে খালকের ব্যাপারে তাঁর (সঃ) কাছে স্বধর্মী-বিধর্মী কোন প্রভেদ ছিল না। আবূ বাসরা গাফফারী নামক জনৈক সাহাবী বলেন, "আমি যখন কাফের ছিলাম তখন একদিন নবীজির (সঃ) আতিথ্য গ্রহণ করি। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম। মহানবী (সঃ) আমাকে তৃপ্তির সাথে খাওয়াতে গিয়ে সমস্ত দুধ প্রদান করে রাত্রিকালে পরিবার পরিজনসহ অনাহারে ছিলেন।"

১০) সমাজের অবহেলিতদের স্বার্থের প্রতি নজর :
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, "এই নবী মু'মিনদের প্রতি তাদের নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশী স্নেহশীল।" নিম্নের কতিপয় ঘটনা দ্বারা এর প্রমাণ মিলে :
ক) একবার রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় কতিপয় যুবক 'পিকনিক' করছিল। নবী করীম (সঃ) ঐ পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যুবকেরা তাঁকে (সঃ) ঐ 'পিকনিকে' আমন্ত্রণ করলে গরীবের বন্ধু দীনের নবী (সঃ) দরিদ্র জনগণের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ঐ আমন্ত্রণে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকেন।
খ) এক গরীব মহিলা মদীনার মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। কয়েকদিন ধরে তিনি না আসায় মহানবী (সঃ) তাঁর খোঁজ নিলেন এবং জানতে পারলেন যে, মহিলাটি মারা গেছেন এবং তাকে দাফন করা হয়েছে। মহানবী (সঃ) একথা শুনে খুবই মর্মাহত হন এবং তার কবরের পাশে গিয়ে দোয়া করলেন।
গ) সা'দ নামে এক বিত্তশালী সাহাবী নিজ ব্যবসা ও বাণিজ্যের কথা মানুষের নিকট গর্বের সঙ্গে বলে বেড়াতেন। নবী করীম (সঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, "কোন মানুষের এ ধারণা থাকা ঠিক নয় যে, তার সম্পদ, সমাজে তার মর্যাদা, প্রতিপত্তি তার নিজের প্রচেষ্টা অথবা ব্যবসায়ের অর্জিত ফল। এসব কিছুই গরীবদের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।"
ঘ) কোন এক গরমকালে দরিদ্র এক শ্রমিক কাজের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন এমন সময় মানবতার নবী করীম (সঃ) তার পিছনে গিয়ে দুই চক্ষু চেপে ধরলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে (সঃ) চিনতে পারলেন, আঁ হযরত ছাড়া আর কে এমন আছেন, যিনি প্রীতির পরশে মানুষকে জড়িয়ে ধরতে পারেন?

১১) অশিক্ষিত লোকদের খেয়াল :
ইসলামের শুরুতে অনেক মরুবাসী অশিক্ষিত লোক মহানবী (সঃ)-এর উপর ঈমান আনেন। এদের মধ্যে জনৈক অশিক্ষিত মরুবাসী মদীনার মসজিদে নব্বীতে নামায পড়তে আসেন। নামায পড়াকালীন সময়ে হঠাৎ তার প্রস্রাবের বেগ আসে। লোকটি মসজিদের বাইরে এক কিনারায় গিয়ে প্রস্রাব করতে শুরু করে। এতে সাহাবীগণ উত্তেজিত হয়ে লোকটিকে প্রস্রাব করতে বারণ করেন। নবী করীম (সঃ) এ দৃশ্য দেখে সাহাবীগণকে বলতে থাকেন, "তাকে প্রস্রাব করতে দাও। লোকটি অজ্ঞতাবশত: ইহা করছে। প্রস্রাবের বেগ ধরে রাখলে তার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়। হোক না সে অশিক্ষিত বা দরিদ্র ব্যক্তি?"

১২) পশু-পাখীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা না করা :
পশু-পাখীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা না করার জন্য নবী করীম (সঃ) তাঁর জাতিকে সাবধান করেছেন। মহানবী (সঃ) ইহুদী এক মহিলার ঘটনা প্রায়ই বলতেন যে, সে এক বিড়ালকে অনশনে মেরে ফেলায় আল্লাহ্‌তাআলা তাকে শাস্তি দেন। অপর এক মহিলার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (সঃ) বলেন যে, এই মহিলা তার নিজের পায়ে জুতা কুয়ার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে তাতে যে পানি উঠতো তা দিয়ে তার তৃষ্ণার্ত কুকুরের তৃষ্ণা নিবারণ করাতো। এ কারণে ঐ মহিলার পূর্বের সমস্ত গোনাহ আল্লাহ্‌ পাক মাফ করে দেন। আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা মহানবী (সঃ)-এর সঙ্গে কোন এক ভ্রমণে জনৈক সাহাবী পাখীর ছানা ধরে। এতে ছানাটির মা ছট্‌ফট করছিল। নবী করীম (সঃ) এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ছানাগুলোকে বাসায় ফেরত দিয়ে আসার নির্দেশ দেন।
অপর এক ঘটনায় এক ব্যক্তি গাধার মুখে প্রহার করছিল। ইহা দেখে তিনি (সঃ) বলতে লাগলেন, "মুখ খুবই সংবেদনশীল। এ জায়গায় মারতে নেই। বরং এর কটিদেশে প্রহার করা যায়।" মুসলমানগণ হুযূর পাক (সঃ)-এর উপদেশ মোতাবেক পশুদের কটিদেশে প্রহার করত এবং কালক্রমে এই অভ্যাস সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

১৩) ধর্মীয় ব্যাপারে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন :
মহানবী (সঃ) সকল ধর্মের লোকদের এবং এর ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। নিম্নের ২/১ টি ঘটনা দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।
ক) তিনি (সঃ) জনৈক ইহুদীর লাশ দেখে মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে যান। সাহাবী বলেন, "হুযূর! ইহা ইহুদীর লাশ!" মানবতার নবী (সঃ) বলে উঠলেন "হোক না সে ইহুদী! সে-ও তো একজন মানুষ। অনুরূপভাবে এক ইহুদী মহিলার ছেলের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সংবাদ পেয়ে নবী করীম (সঃ) সঙ্গে সঙ্গে নিজ দরবার ছেড়ে ছেলেটিকে দেখতে যান। মৃত্যুর পূর্বে তাকে কলেমা পাঠ করান।
খ) নাজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদলকে মহানবী (সঃ) মসজিদে নব্‌বীতে আলোচনার এবং ইবাদতের জন্য ব্যবস্থা করতে গিয়ে পরম সহিষ্ণুতা ও ইসলামের মাহাত্ম্য ও মহানুভবতার পরিচয় প্রদর্শন করেন।
গ) কোন এক যুদ্ধের ময়দানে জনৈক মুশরেক মহিলার লাশ দেখে মানবদরদী নবী (সঃ) ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ক্ষোভের সঙ্গে বলতে থাকেন, "যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে, সে খুবই অন্যায় কাজ করেছে। ভবিষ্যতে যেন কেউ এমন কাজ না করে।" যুদ্ধ-নীতি বিষয়ে তিনি (সঃ) ঘোষণা দিলেন, "কোন নাবালক, কোন বৃদ্ধ, কোন নারীকে কেউ হত্যা করবে না। রাত্রিকালে অতর্কিতে কাউকে আক্রমণ করবে না। কোন উপাসনালয় অথবা এর মধ্যে যারা উপাসনা করে তাদেরকে, ফলবান বৃক্ষকে অথবা কোন শস্যক্ষেত কেউ ধ্বংস করবে না।"

১৪) ব্যক্তিগত শত্রুদের প্রতি মহানবী (সঃ)-এর বিরল আচরণ :
মহানবী (সঃ) তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুদের ক্ষমা করে দেওয়ার এক বিরল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন :
ক) খয়বারের পতনের সময় জনৈক পাপীয়সী ইহুদী মহিলা আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-কে হত্যার জন্য গোশ্‌তে বিষ মিশিয়ে খেতে দিয়েছিল। এই মহিলাকেও হুযূর পাক (সঃ) ক্ষমা করে দেন।
খ) মহানবী (সঃ) তাঁর বিখ্যাত সাহাবী হযরত যায়েদকে নিয়ে তায়েফে গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য; সেখানকার সর্দার আবদইয়ালীন দুষ্ট বখাটে ছেলেদেরকে মহানবী (সঃ)-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়; তারা প্রিয় নবী (সঃ)-কে প্রস্তারাঘাতে রক্তে রঞ্জিত করে ফেলে। সেই সর্দার আবদইয়ালীন যখন ৮ম হিজরীতে দলবলসহ মদীনায় আসে, মহানবী (সঃ) এই সর্দারকে মসজিদে নব্‌বীর উঠোনে তাঁবু খাটিয়ে দেন এবং তাদের মেহমানদারী করেন।
গ) হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর পথে কাঁটা বিস্তারকারী মহিলা যখন ক'দিন হয় আর পথে কাঁটা দিচ্ছিল না। তখন মহানবী (সঃ) তার খোঁজে বের হলেন এবং তাকে রুগ্ন দেখে ঔষধ ও পথ্যাদি নিয়ে তার ঘরে গিয়ে হাজির হন।
ঘ) মদীনার খজরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ্‌ বিন ওবায় বিন সলুল সমগ্র মদীনার রাজা হওয়ার খাহেশ প্রকাশ করত। হুযূর পাক (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করায় তার ইচ্ছায় বাঁধ সাধে। মদীনার পৌত্তলিক গোত্রগুলো ইসলামে দাখিল হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। আব্দুল্লাহ বিন উবায় বিন সলুল এদের প্রধান ছিল। মদীনায় ইহুদী এবং মক্কার কাফেরদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে বিভিন্নভাবে এই মুনাফিক মহানবী (সঃ)-কে মানসিক কষ্ট দেয়। ওহুদের প্রান্তর থেকে হাজার সৈন্যের মধ্যে ৩শ সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে চরম বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয় এই মুনাফিক। তার মৃত্যুর পর নবী করীম (সঃ) জানাযা পড়েন এবং নিজ দেহের চাদর কাফনের জন্য পাঠিয়ে দেন।

১৫) চুক্তির প্রতি অটল সম্মান প্রদর্শন :
দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে অনেক সময় চুক্তি ভঙ্গ করে থাকেন। কিন্তু মহানবী (সঃ)-এর জীবনে এমন ঘটনা একটিও ঘটেনি। হুদায়বিয়ার চুক্তির পর আবূ জান্দাল বিন সুহায়েল ইসলাম গ্রহণ করায় তার পিতা নির্মমভাবে অত্যাচার করে এবং শিকলপরা অবস্থায় সে মদীনায় পালিয়ে আসলে চুক্তির শর্তানুসারে তিনি (সঃ) তাকে পিতার হাতে তুলে দেন। আবূ বসীর নামে মক্কার অপর এক যুবক মদীনায় এসে পৌঁছুলে চুক্তি মোতাবেক তাকেও ফেরৎ পাঠানো হয়। আর রাফে' নামে অপর এক কোরেশ দূত মদীনায় আসার পর মুসলমান হন এবং মদীনায় থাকতে চান। মহানবী (সঃ) উক্ত দূতকে বলেন, "আমি আন্তর্জাতিক বিধান অমান্য করে দূতকে মদীনায় থাকার আদেশ দিতে পারি না। তুমি বরং মক্কায় চলে যাও। ইসলাম গ্রহণ করার অনেক সুযোগ পাবে।"

১৬) মক্কা বিজয় মহানবীর (সঃ) মহানুভবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :
মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সঃ) মক্কাবাসীদের লক্ষ্য করে বলেন, "আমি তোমাদের প্রতি কীরূপ ব্যবহার করবো বলে মনে কর?" তারা সকলে বলে উঠলো, "তুমি আমাদের উদারচেতা ভাই ও উদারচেতা ভাইপো"। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তৎক্ষণাৎ সকরুণ সুরে বলে উঠলেন, "তোমাদের প্রতি কোন অনুযোগ নেই। যাও, তোমরা সকলে মুক্ত।" বিজয়ের মুহূর্তে নবী করীম (সঃ) সমস্ত দুর্ভোগ ভুলে গিয়ে সার্বজনীন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সীজার, আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ানের দেশ জয় নিরীহ জনসাধারণের রক্তপাতের ইতিহাস। Philip K. Hitti মক্কা বিজয়কে "Hardly a truimphant entry in ancient annals is comporable to this" অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাসে এই রক্তপাতহীন মহাবিজয় নজিরবিহীন।" বিধর্মী ঐতিহাসিক গীবনও লিখতে বাধ্য হয়েছেন। "In the long history of the world there is no instance of magnanimity and forgivness which can approach those of Muhammad which all his enemies lay at his feet and forgave them one and all."

-অধ্যাপক রাজিবউদ্দিন আহমদ

সাম্প্রদায়িক অপশক্তির নগ্ন হামলা : মসজিদ ধ্বংস ও পবিত্র কলেমার অবমাননা

বিগত ৬ই জুলাই, '৯৮ তারিখে শেরপুর জিলার ঝিনাইগাতি থানার রাঙটিয়া গ্রামে অবস্থিত আহ্‌মদীয়া মুসলিম ফেরকার একটি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী এলাকার কতিপয় উগ্র মৌলবাদী মোল্লা-মৌলবীর মিথ্যা প্রচারণা এবং জঘন্য কুৎসা ও উস্কানীমূলক রটনার দরুন একদল মারমুখী উশৃঙ্খল লোক মসজিদটি ধ্বংস করে ফেলে। তারা লাঠি-সোটা, রামদা, শাবল, কুড়াল ইত্যাদি অস্ত্রপাতি নিয়ে মসজিদটির উপরে আক্রমণ চালিয়ে মসজিদ ঘরটি ভেঙে ফেলে এবং এর অংশ বিশেষ পার্শ্ববর্তী নদীতে নিক্ষেপ করে। এই সকল ধর্মান্ধ লোকেরা মসজিদে স্থাপিত– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্– কলেমা খচিত একটি বোর্ড ভেঙে ফেলে, পদদলিত করে এবং পরে নদী বক্ষে নিক্ষেপ করে। এই সকল উগ্রবাদী, ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লা-মৌলবী এবং তাদের অনুচরেরা স্থানীয় শান্তি-প্রিয় নিরীহ আহ্‌মদী মুসলমানদের বাড়ীঘর আক্রমণের এবং লুটতরাজের পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি, আহ্‌মদীদের প্রাণ নাশেরও প্রকাশ্য হুমকী দিয়ে বেড়াচ্ছে। এমতাবস্থায়, সেখানকার আহমদীরা বন্দীদশার মধ্যে দারুন আতংকগ্রস্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। আহমদীদের পক্ষ থেকে এই সকল আইন-শৃংঙ্খলা বিরোধী ঘটনা এবং নিরাপত্তাহীনতার কথা জানিয়ে ঝিনাইগাতি থানায় জি.ডি. করার জন্য একটি লিখিত আবেদন করা হয়েছে গত ১১-৭-৯৮ তারিখে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায় নি।

রাঙটিয়ার বিধ্বস্ত মসজিদ : পরবর্তী পর্যায়ে এ ধ্বংসাবশেষও নদীতে নিক্ষেপ করা হয়

উল্লেখ্য যে, অত্র ঝিনাইগাতি থানা এলাকায়, দেশের অন্যান্য অনেক এলাকার মতই, আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে। এই সকল অপকর্মগুলো চালিয়ে যাচ্ছে, অতীতের মতই, পাকিস্তান-ভিত্তিক উগ্র মৌলবাদী সংস্থা 'তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়ত'। বাংলাদেশে এই সংস্থাটির সভাপতি হচ্ছেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতীব মওলানা ওবায়দুল হক সাহেব। এই সংস্থাটির ঝিনাইগাতি থানা শাখা গত ২০শে জুন '৯৮ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম-বিরোধী একটি সভা অনুষ্ঠিত করে। এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুরের মৌলানা সাদেক আলী মাদানী। এতে অশালীন ও উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা সুরুজ্জামান, মওলানা আক্কেল সুফী প্রমূখ। এরা সবাই জামাতে ইসলামের সদস্য এবং তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়তের স্থানীয় নেতা।

৫-৭-৯৮ এই 'তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়াতের' অনুচরেরা গাইবান্ধা জিলার ফুলছড়ি থানার পূর্ব মদনের পাড়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আরও একটি মসজিদ ধ্বংস করে ফেলেছে ও জনৈক গরীব সদস্যের বাড়ী জ্বালিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে তারা উক্ত এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছে।

কাজেই আমরা মনে করি, তথাকথিত মৌলবাদী মোল্লা-মৌলবী এবং তাদের সাগরেদদের এই সকল ধর্ম বিরোধী অপতৎপরতা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা কর্তব্য। এরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সারা দেশে পুনরায় আবার অরাজকতা সৃষ্টির জোর প্রয়াস চালাচ্ছে। এদের অভীষ্ট লক্ষ্য তো ধর্ম নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল।

আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করছি যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ যখন ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সরকার বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধান করে দেশকে স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে-তখন যেমন একটি স্বার্থান্বেষী মহল দেশের নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনগণকে সুড়সুড়ি দিয়ে অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে- তেমনি করে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতীব মৌলানা উবায়দুল হক সাহেবের নেতৃত্বাধীন তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়ত সংগঠনটি এবং জামায়াতে ইসলামী দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তিপ্রিয় আহমদীয়া মসুলিম জামাতের সদস্যদের উপর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। তাদের এহেন কার্যক্রম দ্বারা তারা একটি নন-ইস্যুকে জাতীয় ইস্যু বানানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

আমরা অবিলম্বে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি থানাস্থা পূর্ব মদনের পাড়ায় এবং শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী থানার রাংটিয়ার আহমদীয়া জামাতের সদস্য/সদস্যা নারী-পুরুষ-শিশু তথা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জানমালের সকল প্রকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ও শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ধর্মপালন নিশ্চিত করতে সরকারের আইন-শৃংখলা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

সংবাদ

নতুন চ্যানেল
মুসলিম টেলিভিশন আহমেদিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালে এই প্রথমবারের মতো একটি মুসলিম স্যাটেলাইট চ্যানেলের সংযোগ চালু করা হয়েছে। গত ১৮ই মার্চ শহরের পশু হাসপাতাল রোডস্থ মাহমুদা আহমেদের বাসভবনে এই মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়া ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলে এ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

স্যাটেলাইট টেলিভিশন জগতে মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়া (এমটিএ) একটি ব্যতিক্রমধর্মী চ্যানেল। লন্ডনভিত্তিক এই টিভি নেটওয়ার্ক পৃথিবীর ৫টি মহাদেশে দিবারাত্র ইসলাম প্রচার করেছে। এতে মূল অডিও চ্যানেল ও বাংলাসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান। এই চ্যানেল দৈনিক ১ ঘন্টা বাংলা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ৪ বার বাংলায় বিশ্বসংবাদ প্রচার করা হয়।

দৈনিক আজকের বার্তা
বরিশাল, শনিবার, ২১ শে মার্চ, ১৯৯৮

শুভ বিবাহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিষ্ণুপুর নিবাসী জনাব সিবগাতুর রহমান সাহেবের কন্যা তাসনীম সুলতানার শুভ বিবাহ কিশোরগঞ্জ জেলাধীন তাড়াইল থানার সুরহাল গ্রামের মরহুম ওয়াহেদ আলীর পুত্র, তাড়াইল থানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমাণ্ডার জনাব আব্দুল্লাহ সাত্তারের সাথে গত ১২/৬/৯৮ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ৫৫,০০০/- (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা দেনমোহর ধার্যে দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের ঘোষণা করেন মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী। নবদম্পতি সকলের দোয়া প্রার্থী।

❑ দেওয়ানটুলী, মাহীগঞ্জ রংপুরস্থ (বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ) জনাব খুরশীদ আহমদ, পিতা-মরহুম আঃ হামীদ), এর দ্বিতীয়া কন্যা ইয়াসমিন আরা (লিপি)এর সহিত জনাব ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমদ এর ১ম পুত্র জনাব মহিউদ্দীন আহমদ (সুমন) এর ৫০,০০০/ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেন মোহরে ১২ই জুন, ৯৮ ইং বিবাহ সু-সম্পন্ন হয়। এ বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী। তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন রইল– খালেদ মাহমুদ (সুজন) নারায়ণগঞ্জ।

❑ আমার তৃতীয় পুত্র আবুল বশীর (সাম্প্রতিক বেলজিয়ামের নাগরিকত্ব পেয়েছে)-এর শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় মাসদাইড়, নারায়ণগঞ্জ নিবাসী জনাব মোহাম্মদ আলীর কন্যা মোসাম্মৎ মোমতাজ খাতুনের সাথে গত ১০ই জুলাই, '৯৮ বাদ জুমুআ দারুত তবলীগ, ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদে। দেন মোহর ধার্য হয় ১,২৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মাত্র। আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী এ বিয়ের এলান করেন।

এ বিয়ে যাতে আহমদীয়ত এবং উভয় পরিবার ও নব দম্পতির জন্যে সব দিক থেকে বরকতমন্ডিত হয় সেজন্যে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী– ডাঃ আবুল কাশেম–সন্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবস পালিত

গত ৭ই জুলাই '৯৮ সারা বাংলাদেশে স্থানীয় জামাতগুলোতে অতীব শান ও শওকতের সাথে মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবস পালন করা হয়। নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে। সভা শেষে আনন্দের প্রতীকস্বরূপ মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং বড় বড় জামাতের মসজিদগুলোতে আলোকসজ্জা করা হয়।

এ পর্যন্ত যেসব জামাত থেকে খবর পাওয়া গেছে তারা হলেন-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বি, বাড়িয়া, ঘাটুরা, ক্রোড়া, সুন্দরবন, খুলনা, নাসেরাবাদ, তাহেরাবাদ, তারুয়া ও হালকা মীরপুর জামাত। এখনও খবর আসছে।

–আহমদী বার্তা

শোক সংবাদ

❑ গত ২৫-৬-৯৮ ইং দুপুর ১২.৩০ মিনিটে শেখ হারুণ রশিদ (৯০ বছর) গ্রাম–মিয়াস পাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি দুই স্ত্রী তিন পুত্র রেখে গেছেন। তিনি তাঁর পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন। তাঁর নামাযে জানাযা ঐদিন রাত ৯টায় আহমদীয়া কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে পড়া হয়। আল্লাহ্‌তাআলা যেন তার রূহের মাগফেরাত ও পরিবারবর্গকে ঈমান ও সব্‌রে জামীল দান করেন সেজন্যে সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

– আহমদী বার্তা

❑ গত ২৮শে জুন রবিবার বেলা ১১ ঃ ১৫ মিঃ-এ আমার আম্মা মিসেস দুরুখশাহ্ বানু পক্ষাঘাতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ২০ মাস শয্যাশায়ী অবস্থায় থেকে ঢাকায় মোহাম্মদপুরে আমার বাসায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে....রাজেউন)।

জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর খেদমতে বিনীত দোয়ার আরজ করছি যেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমার আম্মাকে জান্নাতের উচ্চ মোকাম দান করেন। উল্লেখ্য, ঐদিনই রাত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদী পাড়াস্থ আহমদীদের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

– শফীক আহমদ

ওয়াকফে নও মুজাহেদের সাথে পরিচিত হোন

সালহানা তৌহীদ তুবা
ওয়াকফে নও নং ৮০৯৭-এ, জন্ম : ৩১ মে ১৯৯৩
পিতা– এস. এম. তৌহীদুল ইসলাম, মাতা– শাহনাজ পারভীন বাবলী

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 61 ● 1st Issue July 15, 1998 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

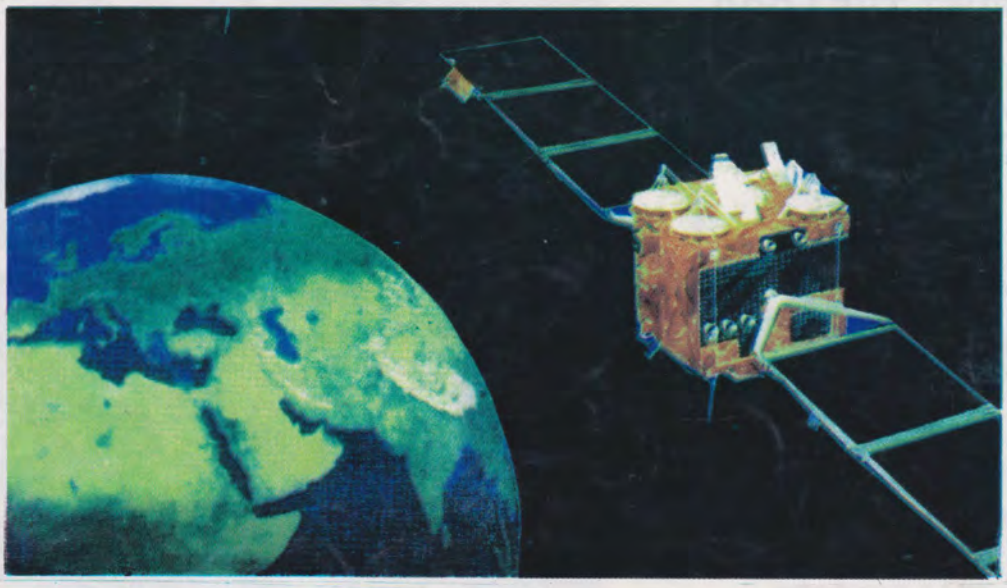

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

Muslim TV

AHMADIYYA

INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্র

দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272